পাওয়া

রমাপদ চৌধুরী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

রিমির স্পষ্ট মনে আছে, মোটা মোটা বইখাতায় ঠাসা ক্যাম্বিসের ভারী ব্যাগটা বয়ে আনতে আনতে কাঁধের ওপর চওড়া স্ট্র্যাপের ভার যতই বিরক্তিকর লাগুক, মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। কারণ ওর শরীরের ভিতরটাও ফুর্তিতে হাসছিল। এ-সময় ভিতরটাও হাসে। তুচ্ছ কারণেও। ওরা ক্লাস এইট থেকে সদ্য নাইনে ওঠা তিন-চারটি মেয়ে একসঙ্গে বাসে ফেরার পথে গল্প করতে করতে এই যে অকারণ ভুবনভোলা হাসি হাসত, চেঁচিয়ে কথা বলত, টুপ করে বাস থেকে নামার পরেও এই উদ্দাম সুখটুকু রিমির শরীরে জড়িয়ে থাকত। মুখের হাসির সঙ্গে দু-চারটে কথা ছুঁড়ে দিত বাসের জানালায়, তারপর হাত তুলে 'বাই'। পরমুহূর্তেই বাসও ছিটকে বেরিয়ে যেত, রিমিও অ্যাবাউট-টার্ন হয়ে দ্রুত বাড়ির পথে। কোনও রকমে বাড়ি পৌঁছে কাঁধের ব্যাগটা, বাপ্‌স কী ভারী, খাটের ওপর কাঁধ খসিয়ে ফেলে দিয়ে স্ট্র্যাপের জায়গায় বার দুই হাত ঘষে নেওয়া, অবশেষে মুক্তি। মা মাঝে মাঝে টিচারদের উদ্দেশে কটূক্তি করত, সেই ছেলেবেলা থেকেই : সব বই কেন যে নিয়ে যেতে বলে ! রিমি কখনও হাসত, কখনও নিজেও অভিযোগ করত। একদিন তো কাঁধ থেকে ব্লাউজটা টেনে সরিয়ে মাকে দেখিয়েছিল। 'এখানটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ !' গায়ের রঙ বেশি বেশি ফরসা বলেই জায়গাটা তখনও লাল হয়ে আছে। 'সব্বোনাশ', বলেই মা নিভিয়া ক্রিম নিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়েছিল। আঃ, মায়ের আঙুলের স্পর্শ, যে আঙুলে আদরের ক্রিম লাগানো আছে, কি যে ভাল লাগে রিমির ! একদিন তো কোন বন্ধুকে বলেই ফেলেছিল, যতই বলিস, মা মানে মা। কারও সঙ্গে তুলনাই হয় না। যে অভিযোগ করছিল তার ভাল নামও হিয়া, রিমির সবচেয়ে গাঢ় বন্ধু। সে বোধহয় এ বয়সে একটু এদিক-ওদিক ছটফট করতে চাইছিল, তাই তার মায়ের কড়া নজরদারির বিরুদ্ধে একটু অভিমান এবং অনেকখানি ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলেছিল বলেই হয়তো রিমির মুখে এসেছিল, 'মা মানে মা'। বলতে পেরেছিল ও, কারণ তখনও রিমি এদিক-ওদিক ছটফট করার কথা ভাবতেই পারত না। এখনও পারে নাকি !

ওর বাঁ চোখের ওপরে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, নিমেষের জন্যে।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিনকার কোন কথাটাই বা স্পষ্ট মনে নেই রিমির! ওর চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের জীবনে এর চেয়ে বড় শক্ আর কখনও পায়নি।

ওর পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, তা হলেও এমন কিছু পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেনি। অবাক লেগেছিল দরজা খোলা ছিল দেখে। তখনও মুখে যেটুকু হাসি লেগে ছিল, কেউ যেন ডাস্টার বুলিয়ে মুছে দিল। কপাট খোলা কেন!

ক্যাম্বিসের জুতো পরা ওদের স্কুলের নিয়ম। এমনকি গরমের দিনেও। কারণ ওই একটাই, এতগুলো মেয়ে স্কুলের মধ্যে জুতো খটখটিয়ে হাঁটলে পড়ায় কান পাতা দায় হবে। ডিস্টার্বেন্স হবে। কোনও একটা মেয়ের মা বুঝি বলতে গিয়েছিল : 'মেয়েদের বড্ড কষ্ট হয়।' বাঁধা গতের উত্তর পেয়েছিল, নিয়ম নেই। আসলে মান্ধাতা আমলের নিয়ম তো, যখন চামড়ার জুতোর সোলটাও চামড়ার হত। এখন কত রকমের সাইলেন্স মার্কা সোল হয়েছে, নিয়ম তার খবরই রাখে না। জুতোর তলা তো দূরের কথা, ওপর থেকেও চামড়া উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাগ্‌দা চিংড়ির মতো চামড়াও এখন এক্সপোর্ট আইটেম।

মোজা আর ক্যাম্বিসের জুতো খুলে ফেলতে পারলেই হোম, সুইট হোম। তার আগে ছুটি-পাওয়া হাসি মুখেই থাকে, শরীরে নয়।

রিমি ভেবেছিল কাজের মেয়েটাকে, মানে বাসন্তীর মাকে দরজা খুলে দিয়ে দিদা চলে গেছে। অর্থাৎ বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

দিদাকে বেশ একটা কড়া ধমক দিতে পারবে ভেবে তখনও মন খুশি-খুশি। দিদিমার বয়েস হয়েছে, চুল সিকিভাগও কালো নেই, দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামতে বেশ কষ্ট হয়। এর আগেও একবার আদরের নাতনির আদুরে ধমক শুনে বলেছেন, মা-মেয়ে দুজনেই সারাদিন বাইরে বাইরে, আমি কি ঘরদোরের পাহারাদার নাকি! দোতলা থেকে নামতে কষ্ট হয়, তা রিমিও জানে। কিন্তু কোনও কোনও দিন দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ার কারণ অন্য। বয়সের জন্যে ভুলো-মন হয়ে গেছেন তাও নয়।

আসলে সারাদিন একা-একা, বসে ঘুমিয়ে খবরের কাগজ পড়ে দিন আর কাটতে চায় না। তিনটে বাজার পর যদি-বা একটু ঘুম আসে, ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতে সদর দরজায় কররর্ কররর্। বুঝতে পারেন বাসন্তীর মা এসেছে। এসে বেল্ বাজাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে, সিঁড়ি ভেঙে নামতে অসীম ক্লান্তি জড়িয়ে থাকে শরীরে, তবু বাসন্তীর মা এলে

খুশিই হন।

ঠিকের লোক, দু বেলা এসে ঘরদোর মুছে, বাসন মেজে দিয়ে যায়। খাওয়ার পর সকালের বাসনগুলো, হাঁড়ি কড়াই পড়ে থাকে। চারটের সময় এসে সে বাসনপত্তর মেজে দিয়ে যায়। ঘুম ভাঙানোর জন্যে যেটুকু বিরক্তি, মুহূর্তে উবে যায় বাসন্তীর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পাওয়ার আনন্দে। একটা মানুষ সারাদিন বাড়িতে একা-একা, কথা বলার লোক নেই, সে যে কী কষ্ট! ঠিকের লোক বাসন্তীর মায়ের আঁচলে গল্পের ঝুড়ি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা ঘটন-অঘটনের খবর শুরু করে দেয়। দেয় বলেই কোনও কোনও দিন সদর দরজায় খিল দিতে ভুলে যান। আর ভুলে গেলেই রক্ষে নেই, স্কুল ছুটির পর ফিরে এসে রিমির যত চোটপাট।

তাই রিমি প্রথমে ভেবেছিল, দিদার কাণ্ড। তা না হলে দরজা খোলা থাকবে কেন।

ঢুকেই বাঁদিকে বসার ঘর, দরজায় একটা পরদাও আছে। কোনওদিন ও উঁকি দেয় না, দেবেই বা কেন। এ-সময় কারও থাকার কথাই নয়। মা অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছটা সাতটা। কোনও কোনও দিন বৃষ্টিবাদলা বা বাসের গোলমাল থাকলে আটটাও হয়ে যায়। এ-সময় ও ঘরে আর কে থাকবে!

জুতোটা ক্যাম্বিসের বলে হয়তো কোনও শব্দই হয়নি।

তা না হোক, কিন্তু কেন যে পরদাটা নিতান্ত অবহেলায় বাঁ হাত দিয়ে ঈষৎ সরিয়ে উঁকি মারতে গেল রিমি!

প্রথমে অবাক, মাকে দেখে। মা! এ সময়ে! চমকে উঠেছিল। পরমুহূর্তে, আরেকজন লোক।

মা হঠাৎ ওরকম করল কেন রিমিকে দেখে? যেন অপ্রতিভ হল। সামনে চেয়ারে বসা লোকটিকে রিমি ভাল করে দেখেওনি। উঁকি মেরেই আবার পরদা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের পড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে তখন তোলপাড়, প্রশ্ন, কৌতূহল।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে, বুঝতে পারল, মা এবং লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সদর দরজার দিকে চলেছে। তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না, কিংবা ঘাড় ফেরাতে অস্বস্তি।

মার গলাটা কেমন করুণ শোনাল। 'আমি শান্তিতে আছি, শান্তিতে থাকতে দিন আমাকে।'

লোকটা কি কোনও অশান্তির খবর নিয়ে এসেছিল? কোনও অশান্তি ঘটাতে চায়? নাকি রিমিকে শোনাবার জন্যেই ওই কথাটা। অর্থাৎ আমি

ডেকে আনিনি, লোকটাই যেচে এসেছে। বসার ঘরে ওকে এসে বসতে না বলে উপায় ছিল না।

বেশ হালকা মন নিয়েই ও স্কুল থেকে ফিরেছিল, মুখে হাসি নিয়েই। অথচ এই ছোট্ট একটা দৃশ্য রিমির বুকের ওপর যেন একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিল।

একটাই প্রশ্ন ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। ওকে হঠাৎ উঁকি মারতে দেখে মার মুখখানা অমন অপ্রতিভ হয়ে গেল কেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বিদায়ই বা দিল কেন।

যদি চেনাজানা কেউ হয়, দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়স্বজন, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে রিমিকে ডেকে স্বাভাবিকভাবে পরিচয় দেওয়ার কথা, আমার মেয়ে!

রিমির বরং উল্টোটাই মনে হয়েছে। যেন রিমি সরে যাওয়াতে মা খুশিই, ঢুকে পড়লে হয়তো সরিয়ে দিত কোনও না কোনও অজুহাতে।

তবু অস্বস্তিকর কিছু ভাবতে ইচ্ছে হল না, কারণ রিমির কাছে মা মানে মা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মাকে নিয়েই ওর পৃথিবী। ওকে নিয়েই মার সমস্ত কিছু। সেখানে আর কেউ থাকতে পারে না। এমনকি দিদাও নয়।

অথচ একটা উটকো লোক এসে কেমন এক রহস্য রেখে দিয়ে গেল। লোক নয়, যেন একটা জলজ্যান্ত অশান্তি।

কিন্তু মা এ-সময় কোনও দিনই অফিস থেকে বাড়ি ফেরে না। আজ ফিরল কেন? জানত কি লোকটা আসবে? নাকি অফিসই যায়নি আজ?

কাঁধের ভারী ব্যাগটা নামিয়ে নিজের অজান্তেই কাঁধের কাছটা হাত ঘষল। তারপর পোশাক বদলাতে গেল।

না, মাকে ও কোনও প্রশ্নই করবে না। মা নিজেই বলুক না। যদি বলার মতো কিছু থাকে।

দিদার ঘরে চলে গেল পোশাক বদলে। —দিদা, কী আছে দাও, আছে কিছু?

প্রচণ্ড খিদে নিয়েই আসে এ-সময়। ভাল কিছু না থাকলে রাগারাগি করে। কিন্তু তখন ওর খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। তবু প্রাত্যহিক ব্যবহার থেকে যাতে এতটুকু এদিক-ওদিক না হয়, সে জন্যেই বলল। যদিও জানে, দিদা যা এগিয়ে দেবে, তা ওর মুখে রুচবে না।

ঠিক তখনই মা এসে ঢুকল দিদার ঘরে।

রিমির মনে হল দিদা যেন চোখে প্রশ্ন এনে তাকাল মার দিকে। ফলে

মার মুখের দিকে তাকাব না তাকাব না ভেবেও ঘাড় ফেরাতে হল।

চোখে ভুরুতে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের টুসকি দিল মা।

রহস্য আরও ঘনিয়ে উঠল রিমির মনে।

তা হলে দিদা জানে যে লোকটা এসেছিল। অশান্তিটা কি, তাও। অথচ রিমির সামনে ওরা কিছুই বলবে না।

মার ওপর ওর প্রচণ্ড রাগ হল। লোকটার সঙ্গে একান্তে বসে কথা বলতে দেখে ওর যে অস্বস্তি লেগেছিল তার জন্যে অনুশোচনাও হল।

মনে মনে বললে, আমার কি দোষ। মাকে কখনও এভাবে বসে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। বিশেষ করে অপরিচিত কারও সঙ্গে।

দিদা আর রিমির সঙ্গে যত হাসাহাসি গল্পগুজব শলাপরামর্শ করে মা, সে এক অন্য চরিত্র। বাইরে বের হলেই মা কেমন ঋজু কঠিন, গাম্ভীর্যের বর্ম পরা অন্য এক মানুষ।

তার সঙ্গে এই দৃশ্যটাকে কিছুতেই যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না

শেষ অবধি কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। মাথার মধ্যে এমন জট পাকাচ্ছিল যে হিয়াকে, ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিয়াকে হয়তো বলেই ফেলত। কিন্তু ভয় হল, ওরা-না মা সম্পর্কে কিছু খারাপ ভেবে বসে। রিমি তো জানে ওদের ওই বয়সটা শুধুই সন্দেহ করে, শুধুই সন্দেহ করে।

রিমির উপস্থিতিতে ওরা কোনও আলোচনা করতে চায় না বলেই হয়তো মা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ডাক দিল, রিমি, খাবি আয়।

ওর বুঝতে অসুবিধে হল না, মা ওকে ও ঘরে খেতে বসিয়ে দিয়ে দিদার সঙ্গে কিছু বলা-কওয়া করবে।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রিমি।

কনকনলিনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, মা আজ আপিস যায়নি ?

চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিলেন। ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, না।

কল্যাণী অফিস থেকে যে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে সে কথাটা চেপে গেলেন।

মা অফিস গেছে কি যায়নি রিমির তা জানার কথা নয়। ওকে বেরিয়ে পড়তে হয় অনেক আগেই। সকাল থেকেই ব্যস্ততা, মার শরীর ভাল কি মন্দ, অফিস গিয়েছিল কি যায়নি, তা জানতে পারে স্কুল থেকে ফেরার পর।

কিন্তু মাকে দেখে মনে হল না অফিস না-যাওয়ার মত কোনও কারণ

ঘটেছে। অন্তত সর্দি জ্বর পেটব্যথার মত কোনও অসুস্থতার চিহ্নও নেই তার মুখে চোখে। তা হলে? ওই লোকটার সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে যার জন্যে মা একটা দিন অফিস কামাই করল।

বুঝতে পারল দিদার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পারবে না।

কনকনলিনী আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেছেন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, টিকলো নাক, সোনা রঙের চকচকে কপালে ঈষৎ প্রশস্ত হয়ে সাদা-কালোয় মিশ খাওয়া কোঁকড়া চুলের মানুষটার দিকে তাকালেই বিগত দিনের রূপটুকু ধরা যায়।

হিয়া একদিন বলেছিল, তোর দিদা খুব সুন্দরী ছিলেন, না রে!

রিমি হেসে উঠে বলেছে, কি করে জানব? আমি তো তখন জন্মাইনি।

হিয়া প্রত্যয় দিয়ে বলেছে, ছিলেন। জিগ্যেস করে দেখিস।

দিদিমা, মানে দিদা, যৌবনে কেমন ছিলেন তা জানার আগ্রহ রিমির কোনও কালেই ছিল না। হয়তো সুন্দরীই ছিলেন, কিন্তু মাকেই ওর বেশি সুন্দর লাগে। মার কিছুটাও যদি পেত। নাঃ, পেয়েছে বোধহয়। কিছুটা নিশ্চয়ই। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়।

দিদাকে ও দিদা হিসেবেই দেখে আসছে। ধীর পায়ে টুকটাক সংসারের এটা ওটা করে, বাসন্তীর মার সঙ্গে গল্পগুজব, রিমি স্কুল থেকে ফিরলে সদর দরজা খুলে দেওয়া, হাঁটুর ব্যথা নিয়ে গুটিগুটি সিঁড়ি ভেঙে ওঠা, আর সকাল থেকে সন্ধে অবধি চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়া। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যে এত পড়ে! দু-চার লাইনের যে-খবর কারও চোখে পড়ে না, দিদার কাছে সে-খবরও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সে কি কল্যাণী, পড়িসনি তুই? আজকের কাগজেই তো আছে...

রিমির মার নাম কল্যাণী।

মা হেসে ওঠে কোনও কোনও দিন। বলে, একেবারে বাচ্চা বয়েসের ছেলেমেয়েরা বড় জিনিস দেখতেই পায় না, মেঝেতে একটা পিঁপড়ে কিংবা চাল পড়ে থাকলে সেটাকেই দেখতে পায়। তোমারও দেখি তাই।

কনকনলিনী হাসেন। বয়সী মুখে হাসিটা দেখতে রিমির ভালই লাগে।

বুড়ি দিদিমার মুখের দিকে তাকাল রিমি। কঠিন কঠোর। কাগজ পড়ছে না অন্য কিছু ভাবছে, কে জানে।

তবু প্রশ্ন না করে পারল না। বললে, লোকটা কে দিদা?

লোকটা, অর্থাৎ ওই লোকটা, যে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যার সঙ্গে বসে মা কথা বলছিল, এবং রিমিকে উঁকি মারতে দেখেই মা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিল।

এই মাকে নিয়ে ও ছেলেবেলায় কম কষ্ট ভোগ করেনি। কি অসহ্য যন্ত্রণা, এরা তার কিছুই জানে না। রিমি সেই কষ্টের কথা, সেই মাথা-নিচু ভয়-ভয় চাপা কান্না কোনও দিন কাউকে দেখতে দেয়নি।

সরলভাবেই ও প্রশ্ন করল, লোকটা কে দিদা ?

উত্তর এল, সংসারের সবই কি তোমাকে জানতে হবে ? ও কেউ নয়।

ব্যস্।

বেশ রাগ-রাগ মুখ করে রিমি চলে গেল, মা খেতে ডেকেছে। দিদার কাছ থেকে এই কড়া কথাটা শোনার পর কিছুই আর মুখে রুচবে না ও জানে, তবু।

ছেলেবেলা থেকে কতবার শুনেছে। মার কাছে, দিদার কাছে। একটাই কথা, তোর এত কৌতূহল কেন ! কিংবা বড়দের কথায় নাক গলানো স্বভাবটা ভাল নয়। অথবা, তোর জানার মতো হলে জানাতাম।

অথচ কোনও দিনই সরাসরি জানায়নি, হয়তো জানাতে পারেনি।

প্রথম শুনেছিল মামিমার কাছে। আসলে মা'র মামিমা। ছেলেবেলা থেকেই মা'র বড়মামা ছোটমামা ওরও মামা। কেউ শুধরে দেয়নি। বরং মজা পেয়েছে।

বলেছিল, তোর মা যে তোকে কিভাবে বুক দিয়ে আগলে আগলে বড় করেছে। দেখিস রিমি, মাকে যেন কোনও দিন কষ্ট দিস না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, মেয়েদের কাছে এ যে কী অপমান, কী কষ্ট, তা যদি জানতিস !

এইটুক শুনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ও।

কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মামিমার কাছ থেকে আর কোনও কথাই বের করতে পারেনি। শুধু বলেছে, তোর মাকে জিগ্যেস করিস। কিংবা দিদাকে।

দুই

এই দিনটাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে এসেছিল কল্যাণী। জানত একদিন রিমির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই। তবু মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি। নাকি সাহসই হয়নি ওর।

তখন রিমির বয়েস দুই কি তিন। এক্কেবারে শিশু।

জেঠতুতো দিদি বেড়াতে এসে বলেছিল। বেড়াতে না মজা দেখতে কে জানে। সংসারে এ রকম কিছু ঘটলে আত্মীয়স্বজনদের কৌতূহলের শেষ থাকে না। শুধু কি কৌতূহল! মুখে সমবেদনার থমথমে ভাবটুকু বজায় রেখে আসে ঠিকই, কিন্তু মনের গোপনে লুকোনো থাকে পোস্টমর্টেমের ছুরিকাঁচি। লাশটাকে কেটে ফালা ফালা করে শরীরের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে দেখতে চায়। খুঁজে বের করতে চায় অজ্ঞাত রহস্যটুকু।

কল্যাণী সে-সময় শুধুই একটা লাশ। মনের দিক থেকে।

সুধাদি সমবেদনার মুখে রিমির বাচ্চা শরীরটা কোলে তুলে নিয়ে তাকে আদর করতে করতে গালে গাল ঘষে দীর্ঘশ্বাস মেশানো গলায় বলেছিল, বেচারি!

কল্যাণী সে-সময় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারত না। কেমন একটা দ্বিধা, একটু সন্দেহ। কারও মুখে ব্যথা আঁকা থাকলেও মনে হত ওটা কপট ব্যথা। ভাবত, সবাই বেশ মজা পাচ্ছে। কেউ কিছু বললে বা জিগ্যেস করলে বড় অপমান লাগত।

আবার এক একসময় কি যে হত, কেউ সমবেদনা দেখালে একেবারে ভেঙে পড়ত। ভরসা হিসেবে তাকেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত। আসলে কোনও লোকজনই ও তখন সহ্য করতে পারত না। কেউ না এলেই যেন বাঁচে। ভেতর থেকে বলে উঠত, আমাকে একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও। অথচ একা থাকাও যে কি দুঃসহ ছিল, এখনও মনে পড়ে।

সুধাদি বললে, আরেকটু বড় হতে দে, তারপর একটু একটু করে বলে দিস।

কল্যাণী কি করবে, কোথায় দাঁড়াবে ঠিক নেই। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। নিজেকে নিয়েই ও তখন অস্থির। অত দূরের কথা

ভাবতেও ইচ্ছে করেনি।

সুধাদি বললে, ছেলেবেলা থেকে জেনে গেলে ওর কাছে আর শকিং লাগবে না। বড় বেলায় যদি শোনে...

কনক চুপচাপ ছিলেন। ওঁর ভেতরটাও তখন খাঁ খাঁ হয়ে গেছে। চোখের পিছনে যেন জলও শুকিয়ে গেছে।

এইসব লোকজন আসা, উপদেশ-টুপদেশ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া, মনের কোণে তখনও একটা ক্ষীণ আশা। সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে। যদিও মনের মধ্যে সদা সর্বদা চাপা রাগ গুমরে উঠত।

সুধার কথা কানে যেতেই বিরক্তির কণ্ঠে বললেন, ওসব রাখ তো, পরের কথা পরে ভাবলেই চলবে।

সুধা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, তাই বলছিলাম।

কল্যাণী একটা কথাও বলেনি। হাঁটুতে কোমরে জোর নেই এমন অসহায় মানুষ ও তখন, আবার বিগত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেলেই ওর ভেতরটা ফুঁসে উঠতে চাইত।

মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে কল্যাণী আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াত। এই বাড়িটার মধ্যেই। এই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে। চেহারাও যে ক্রমাগত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তা আয়না না দেখেও টের পেত। তার জন্যে কোনও দুর্ভাবনাও ছিল না।

মায়ের ছোটমামা এসে একদিন বললে, চেহারাখানা কি করছিস দিনকে দিন। এসব কি হয় না নাকি? তোর জীবনেই প্রথম হল?

এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলেছিল কল্যাণী। ফুঃ করে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করেছিল। —চেহারা? চেহারা নিয়ে হবেটা কী, ছোটমামা।

ছোটমামা বললে, শরীরস্বাস্থ্য জিনিসটা ফ্যালনা নয়। চেহারা থাকলে তবেই বেঁচে থাকা যায়, নতুন করে বাঁচা যায়।

বিষণ্ণ হাসি এসেছিল কল্যাণীর মুখে। —আমার আবার বেঁচে থাকা।

এতসব কথা ও বলতে পেরেছিল, কারণ মানুষটা ছোটমামা। যে মানুষটাকে ওর খুবই আপন মনে হত। এখনও হয়। জানে, মুখে কোনও সমবেদনা বা দুঃখের ছাপ না থাকলেও কল্যাণীর কষ্ট ওই ছোটমামার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সে জন্যেই জোর করে এমন একটা ভাব দেখায় যেন কোথাও কিচ্ছু হয়নি, সব ঠিকঠাক আছে, সব ঠিকঠাক চলবে।

ছোটমামা স্কুল টিচার, তবে স্কুলমাস্টার বললেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে তেমন নয়। বেশ ফ্যাশানদার ফ্রেমের চশমা পরে, দামি কাপড়ের ট্রাউজার্স। দামি জুতো। স্কুলটা যদিও বাংলা মিডিয়াম। টিউশনি না করলে এত সব হয় না, কিন্তু ছোটমামা টিউশনিকে বড্ড ঘেন্না করে। এ-সবের খরচ জোটে পৈতৃক সঞ্চয়ের এক-তৃতীয়াংশ ছোটমামাও পেয়েছে বলে, অবশ্যই দাদু মারা যাবার পর।

সঙ্কুচিত হয়ে থাকাই স্বভাব হয়ে গেছে কল্যাণীর, তবু ছোটমামা যেন এ-বাড়িতে একটা খোলা জানালা। ও সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে। এই একজন এলে, ও সব ভুলে থাকতে পারে। আসলে কল্যাণীও চায় সবাই ভুলে থাকুক।

হাসবার চেষ্টা করে বললে, নিজের জন্যে ভাবি না, এই রিমিকে নিয়েই...

—গোলি মারো। ওসব ছাড় তো, আমরা আছি কেন ?

একটু থেমে বললে, আমি আছি।

তারপর বললে, চেহারাটা ভাল কর। আর বি. এডে ভর্তি হয়ে যা।

অন্যদের সঙ্গে ছোটমামার তফাত এখানেই। দুঃখ জানায় না, সমবেদনা জানায় না। হাতে একটা ঢিল তুলে দিয়ে বলে, গাছটার মাথা লক্ষ করে ছুঁড়ে দে। শুনলেই ছুঁড়তে ইচ্ছে করে।

বাবাও একদিন বললে, তুই একটু বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসিস না কেন, মনটা তো ভাল থাকবে।

কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায় বেড়াবে। রিমিকে ইচ্ছে করলে মার কাছে রেখে দিয়ে যাওয়া যায়, সঙ্গে নিয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। কিন্তু মন ? মন কার কাছে রেখে যাবে। যেখানেই যাক ও, সঙ্গ ছাড়বে না। পার্কে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে একা বসলেই কোত্থেকে যে প্রচণ্ড রাগ এসে ফেটে পড়তে চায় ! কিংবা তখন হতাশ লাগে নিজেকে।

পাড়ার কেউ অকারণে মুখের দিকে তাকালেও মনে হয়, সব জেনে গেছে ও, মনে মনে হাসছে।

জানত না তার চেয়েও বড় দুঃখ লুকিয়ে আছে। রিমিকে তা বলতে না পারার দুঃখ। নিজের মেয়ের কাছেই সঙ্কোচ। কি করে বলবে ভেবেই পেত না।

মনে পড়ে যেত সুধাদির কথা।

মা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। 'সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে।'

কল্যাণীর মনে আছে বাবা কিন্তু একটা কথাও বলেনি। হয়তো সুধাদির কথাগুলো কানেও যায়নি। ঘরের এক কোণে জানালার আলোয়

বসে মোটা একখানা বইয়ের পাতায় ডুবে ছিল। ওটা যে আইনের বই তাও জানত না।

বাবা একদিন খুশি-খুশি মুখে বললে, তুই ভাবিস না কল্যাণী। অক্ষয় বলেছে ডিভোর্সটা কোনও সমস্যাই নয়। কিন্তু বাছাধনকে এত টাকা...

একটু থেমে বলেছিল, এত টাকা দিতে হলে সুবিমল কত সুখে থাকে দেখব।

—টাকা ? কল্যাণী অস্ফুটে বলে ফেলেছিল।

কত টাকার কথা বাবা বলেছিল তাও ওর কানে যায়নি।

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো প্রচণ্ড একটা চাপা রাগ কল্যাণীর মনেও। ইচ্ছে হত যে কোনও উপায়ে প্রতিশোধ নিতে। কিভাবে প্রতিশোধ নেবে খুঁজে পেত না বলেই বড় অসহায় লাগত। এত অসহায় লাগত যে, ভেতরে ভেতরে নির্জীব হয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো কখনও কখনও ভেবে বসত, ও আসলে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কিছুই ঘটেনি। আশা করত অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে। সুবিমল হঠাৎ একদিন বিমর্ষ মুখ নিয়ে এসে হাজির হবে।

সত্যি যদি সেভাবে কোনওদিন এসে হাজির হয়, কল্যাণী কি করবে ভেবে পেত না। ক্ষমা করার কথা মনে এলেও দপ্ করে জ্বলে উঠত। ওই মানুষটাকে ওর এখন ঘেন্না করে, ঘেন্না করে। এক ছাদের নীচে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সে তো তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার সমান।

বাবার ওপরই মনে মনে রেগে গিয়েছিল কল্যাণী। বাবা কি করে টাকার কথা বলল ! বাবার উকিল বন্ধু অক্ষয়কাকার সঙ্গে শেষ অবধি বাবা কিনা লোকটাকে জব্দ করতে চাইছে এভাবে ? অনেক টাকা আদায় করে। ওরা কি এটুকুও বুঝতে পারছে না, কল্যাণীকে এমন করে যে অপমান করেছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তার কাছ থেকে যত টাকাই আদায় করে দিক না কেন অক্ষয়কাকার আইন আদালত, সে টাকা ছুঁতেও ইচ্ছে হবে না ওর।

'ডিভোর্স পেতে কোনও সমস্যাই হবে না।' বাবার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে এমন কিছু আশা করেছিল কি ! না, আবার সেই পুরনো দিনগুলো ফিরে আসবে এমন কোনও স্বপ্ন ওর মনেও ছিল না। ফিরে যাওয়ার কথা ও ভাবতেও পারে না। সুবিমল এসে যদি ওর সামনে ছলছল চোখে দাঁড়ায়, তা হলেও না। অসীম ঘৃণা আর অনেকখানি ক্রোধ ছাড়া যার সম্পর্কে ওর মনের মধ্যে আর কিছুই নেই, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও ইচ্ছে করবে

না।

কিন্তু তা বলে ডিভোর্স ? নিজে মুক্তি পাবে বলে ওই মানুষটাকে কল্যাণী মুক্তি দিয়ে দেবে ? বাবা এ-কথা ভাবল কি করে।

ওর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল রাগে। ওই একটাই অস্ত্র ওর হাতে আছে। জব্দ করার। শাস্তি দেবার।

এই অমানুষ, এই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারগুলোকে ভগবান কোনও শাস্তি দেয় না। সমাজ শাস্তি দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে শুধু কল্যাণীর মতো অসহায় মেয়েদের। কোলে দু-বছরের একটা নিরপরাধ শিশুকে নিয়ে যাদের বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

প্রথম যখন চলে এসেছিল, চলে আসতে হল, শুধুই প্রচণ্ড এক অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, সেদিন এই বাড়িটাও হয়ে উঠেছিল অশান্তির অগ্নিকুণ্ড। ও নিজের মুখটা তো দেখতে পায়নি, দেখতে পেত শুধু বাবা আর মার মুখ। সে মুখে নিজেরই ছায়া দেখতে পেত। কারও মুখে কোনও কথা নেই, হাসি নেই, কারও যেন কোনও কাজ নেই। শুধু নিশ্চুপ বসে থাকা, ব্যথার, বিমর্ষতার চাপা কান্না আটকে রাখা।

বাবা মার একটাই আশঙ্কা, ডিভোর্স করে দেবে না তো !

যেন ডিভোর্স না করলে একটা ক্ষীণ আশা থাকে, আবার হয়তো কোনওদিন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আবার হাসি আনন্দ, সুবিমলের বিনয়-মাখানো মুখে মাথা নামিয়ে প্রণাম করা। কুশল জিগ্যেস করা, আপনজনের মত। বাবার বুকের ভেতর তখন ওই একটাই আতঙ্ক।

সেজন্যেই হয়তো অক্ষয়কাকাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন।

বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির জল ঝরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন অক্ষয়কাকা।

বললেন, ডিভোর্স করবে ? ডিভোর্স পাওয়া এত সহজ নাকি !

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার বাবা পাগল হয়ে গেছেন।

সে-রকম একটু ভয় কল্যাণীরও ছিল। অক্ষয়কাকার কথায় অনেকখানি ভরসা পেল। অনেকখানি শান্তি।

মনে মনে ভাবলে, না ডিভোর্স ও কিছুতেই দেবে না সুবিমলকে, কিছুতেই না।

ভেবেছিল, ডিভোর্স না দেওয়াই ওর হাতে একমাত্র অস্ত্র। এই অপমানের, এই সমাজের কাছে মুখ লুকিয়ে থাকার, রিমি বড় হওয়ার পর তাকে সব কথা বলতে না পারার, অথবা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে

ওঠার লজ্জা—এ-সবের প্রতিশোধ নেবার একটাই রাস্তা।

ডিভোর্স নিলেই তো সুবিমলের মুক্তি। হাসি হাসি মুখে দিব্যি গরদের পাঞ্জাবি পরে রঞ্জনাকে বিয়ে করে বসবে।

ডিভোর্স না পেলে সুবিমল যা খুশি করে বেড়াক, কিচ্ছু যায় আসে না কল্যাণীর। হঠাৎ কোথাও কোনওদিন দেখা হয়ে গেলে, সুবিমলের পাশে রঞ্জনাকে দেখলে, ও তর্জনী তুলে রঞ্জনাকে দেখিয়ে বলতে পারবে, ওই তো সুবিমলের রক্ষিতা। হয়তো সুবিমলের নামটাও উচ্চারণ করতে পারবে না। বলবে, জানোয়ারটা ওই রক্ষিতাকে নিয়ে আছে।

বাবার কথা শুনে ও তাই রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। —কি বলছ তুমি বাবা, ডিভোর্স করব কেন? আমি চাই ওরা দুজনই সারা জীবন জ্বলেপুড়ে মরবে। ওই নোংরা মেয়েটা দেখুক, রক্ষিতা হয়ে থেকে কত সুখ।

মনে মনে ভেবেছিল, আমার এই রিমিকে বড় হয়ে বলতে লজ্জা করবে যে, বাবা নেই, কিংবা বাবা চলে গেছে। তেমনই ওর ছেলেমেয়েদের দিকেও আঙুল দেখিয়ে সবাই বলবে, অবৈধ সন্তান। ইল্‌লেজিটিমেট চাইল্ড। সেটাই একমাত্র প্রতিশোধ।

রাগ মুখ ফসকে কখন যে কি বের করে দেয়। 'রক্ষিতা' শব্দটা কল্যাণী কোনও দিন বাবার সামনে উচ্চারণ করেনি। করে ফেলল।

বাবা বিষণ্ণ হাসি হাসল। বললে, ওকে শাস্তি দিতে গিয়ে যে তুই নিজেকেও শাস্তি দিচ্ছিস। তোরও তো একটা জীবন আছে, নতুন করে শুরু করতে পারবি। অক্ষয় বলছিল, একটা মোটা টাকা আদায় করে দিতে পারলে, তোর সুরাহা হবে কিছুটা, রিমিরও।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কল্যাণী বলেছিল, ও টাকায় আমি থুথু ফেলি। আমাকে নিয়ে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজের পায়েই দাঁড়াব, রিমিকে মানুষ করব।

ত্রিদিব বোধহয় একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন। সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। কল্যাণীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোরই বা চিন্তা কিসের। আমার কি কিছুই নেই নাকি? তোর দাদারা বাইরে বাইরে আছে, সুখেই আছে, আমার কাছে ওরা কিছু আশাও করে না। তুই আর ওই একফোঁটা একটা নাতনি। সে টাকা আমার আছে, সে টাকা আমার আছে।

কল্যাণী বললে, তবে আর টাকার কথা তুলছ কেন?

ত্রিদিব হাসলেন। বললেন, তুই ডিভোর্স না দিয়ে শাস্তি দিতে চাইছিস, আমি ভাবলাম একটা মোটা টাকা আদায় করলে আহাম্মকটা

উচিত শাস্তি পাবে। নেশা তো ছেড়ে যাবে দুদিন বাদেই, তখন উঠতে বসতে ওই বজ্জাত মেয়েটাকে খোঁটা দেবে, তোমার জন্যেই এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল।

দৃশ্যটা যেন উপভোগ করছিলেন কনকনলিনী। বাবা আর মেয়ের কথোপকথন শুনছিলেন। একটাও কথা বলেননি এতক্ষণ।

বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোরা শুধু স্বপ্নই দেখ। শান্তি, শান্তি। নিজের কথাটা কেউ আর ভাবছিস না। যা চুকেবুকে গেছে, তা মুছে ফ্যাল। পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন—আমি কারও পরোয়া করি না। যা ভাল মনে হয়, তাই কর।

কল্যাণীর মনে পড়ল, ছোটমামাও ঠিক এমনিভাবেই বলেছিল। তবে হালকা রসিকতা মিশিয়ে। বলেছিল, পিছনের জীবনটা কী জানিস? ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চকখড়ির লেখালিখি। ওটা ডাস্টার দিয়ে মুছে না ফেললে নতুন কিছু লেখা যায় না।

এত বিষণ্ণতার মধ্যেও হেসে ফেলেছিল কল্যাণী। আসলে ছোটমামা এলে ওর মধ্যে যে আর বিষণ্ণতাই থাকে না। হেসে ফেলে বলেছিল, তোমার মধ্যে থেকে মাস্টারির গন্ধ আর যাবে না।

চেষ্টাচরিত্তির করে ছোটমামাই ওকে বি. এড ক্লাশে ভর্তি করে দিয়েছিল। ভাগ্যিস এম. এ-টা আগেই করে রেখেছিল।

শেষ অবধি সেই নিজেই রাজি হয়ে গিয়েছিল ডিভোর্সে। মুক্তি পাবার জন্যেই। পেয়েও গেল। কিন্তু কি থেকে মুক্তি? শুধু পুরনো পদবিতে ফিরে এলেই কি সব মিটে যায়! রিমির নামের সঙ্গে যে স্মৃতিটাও রেখে দিতে হয়েছে।

—বা রে, তোমার পদবি আর আমার পদবি এক নয় কেন? আর কারও তো এ রকম নয়। রিমি যখন আরও ছোট, একদিন বলেছিল।

কল্যাণী বেশ বিব্রত বোধ করেছিল সেদিন। কোনও রকমে বলেছিল, তোমার বাবা নেই বলে।

আর কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেনি রিমি। অত বুঝতও না তখন। মা যা বলত, তাই বিশ্বাস করত।

একটু একটু করে আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই যে জানেনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো কেমন যেন অস্বচ্ছ লাগত রিমির কাছে।

মামার বাড়িতে ওদের নেমন্তন্ন সেদিন। অকারণেই। মাঝে মাঝেই করত।

আর মামিমা, মানে বড়মামিমা, এক ফাঁকে বললে, মাকে যেন কোনওদিন কষ্ট দিস না।

বললে, তোর মা যে তোকে কিভাবে বুক দিয়ে আগলে আগলে বড় করেছে।

রিমির মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মামিমা কিন্তু আর একটা কথাও বলেনি। শুধু বলেছে, তোর মাকে জিগ্যেস করিস। কিংবা দিদাকে।

'বাবা নেই' কথাটা যে-বয়সে প্রথম শুনেছিল রিমি, সেই বয়সটার কথাই ওর মনে পড়ে না। তার পরও কয়েকবার শুনেছে। শুনেছে বটে, কিন্তু কথাটা ওর মনের ওপর দাগ রেখে যায়নি। অন্তত শৈশবের দিনগুলোতে নয়ই। বাবা কী, তাই তো ও জানত না। বাবার অভাব বোধ করেনি কোনওদিন। মা সে অভাব কোনওদিন বুঝতে দেয়নি। ও সেই ছোট্টটি থেকে দেখে আসছে মাকে, দাদু আর দিদাকে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন হিয়া ওকে জোর করে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। জোর করে নিয়ে গিয়েছিল বললে ভুল হবে, ওর নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আসলে ওদের বাড়িতে লোকজন বড় একটা কেউ আসত না। ওরাও মামার বাড়ি ছাড়া কোথাও যেত না। রিমির মনে হত, মা শুধু নিজেকেই আটকে রাখেনি, রিমিকেও যেন চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে। এক একসময় ওর বড় একা একা লাগত। স্কুলটাই যেন ওর একমাত্র মুক্তির জায়গা, খোলা আকাশ।

হিয়া ওর হাত ধরে ওদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। তার মাকে গিয়ে বললে, দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি। রিমি। আমার বন্ধু।

হিয়ার মা হাসলেন। —তাই বুঝি! একসঙ্গে পড়ো? এক ক্লাসে?

পাশের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক বলতে বলতে এলেন, কে রে হিয়া? কাকে এনেছিস?

রিমিকে দেখেই হেসে ফেললেন। —ও তুমি? হিয়ার বন্ধু বুঝি?

ও একটু লজ্জা পাচ্ছিল, হিয়ার মাকে দেখে যদিও ওর একটুও লজ্জা লাগেনি, তাই কথা না বলে চোখ নামিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

আর হিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বাপি বাপি, তোমাকে সেই যে রিমির কথা বলি, এই সে।

ছোট ছিল বলেই, নাকি রিমি একটু বোকা বোকা, ও কিছুই বুঝল না, শুধু অপরিচিত একটি লোকের উপস্থিতির জন্যে শরীরে এবং মনে আরও সঙ্কুচিত হল। শাড়ি তো পরত না তখন, তবু স্কার্টেই যেন পা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

হিয়া যাকে 'বাপি' বলল, সেই মানুষটাকে কিন্তু রিমির খারাপ লাগেনি। এক একটা মুখে যেমন হাসি ছাড়া আর কিছুই মানায় না, সেই

রকম।

বলে উঠলেন, আরে বাব্বা, তা হলে তো রীতিমতো ভি আই পি।

হিয়ার মার দিকে ফিরে বললেন, দেখো, ভাল করে আদরযত্ন কোরো যেন। তা না হলে হিয়া আমাকে আস্ত রাখবে না।

হিয়ার দিকে ফিরে বললেন, তোর বন্ধু তোরই মতো ক্যাডবেরি পাগল তো! দাঁড়া, নিয়ে আসছি।

'না, না' বলে যে আপত্তি করবে তাও পারেনি রিমি।

হিয়ার মা ওদের বসতে বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন। কি একটা চটপট বানিয়ে নিয়ে এসে দিলেন।

ক্যাডবেরিটা হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বাবা বললেন, জানো রিমি, এ-বাড়িতে আমার বন্ধুদের কোনও দাম নেই। হিয়ার বন্ধু সব সময়েই ভি ভি আই পি। বলে হাসলেন।

বেশি দূর তো নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়, রিমি একাও ফিরতে পারত, তবু হিয়া আর হিয়ার মা ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

হিয়ার মা তখনও বেরোননি, রিমি আর হিয়া অপেক্ষা করছে বাইরে, কি বোকা ছিল রিমি, বললে, বাপি কে রে?

হিয়া অবাক হয়ে বললে, কে আবার, বাবা! বাবাকে আমি তো 'বাপি' বলি।

বাবা কী বস্তু তা যে ও জানত না, তা নয়। কিন্তু খুব ভাল বুঝতে পারত না। 'বাবা' ডাক শুনেছে, মা দাদুকে 'বাবা' বলত। কিন্তু ওর বয়সী একটা মেয়ের, মানে হিয়ার বাবাকে দেখে, কেমন আদর আদর ভঙ্গিতে হিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওর ভেতরটা আনন্দে গলে গেল। একটুক্ষণের জন্যে মনে হল ওরও একজন বাপি থাকলে কি ভালই না হত।

বেশি দূর তো নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়, রিমি একাও ফিরতে পারত, তবু হিয়া আর হিয়ার মা ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রিমি ওদের হিয়ার মাকে, বাড়ি অবধি আসতে দেয়নি। — ওই তো বাড়ি, আমি চলে যাব, চলে যাব।

আসলে ও হয়তো একটু ভয় পাচ্ছিল। ওরা রিমিকে এত আদরযত্ন করল, এখন মা যদি ওদের সেভাবে আপ্যায়ন না করে, ওর যে মাথা কাটা যাবে! একটা ছোট্ট প্রশ্ন ওর মনে যে উঁকি দেয়নি তাও নয়। হিয়া যদি প্রশ্ন করে বসে, তোর বাপি কোথায় রে!

স্কুলের সবাই যার-যার বাবার কথা, মার কথা বলত।

ও বলত শুধু মার কথা, দাদু-দিদার কথা, এমনকি মামা-মামিমার

কথাও।

হঠাৎ একদিন একটা মেয়ে বললে, তোর বাবার কথা কিছু বলিস না কেন রে!

একটু থমকে গিয়েছিল রিমি, তারপর হালকা সুরেই হেসে বলেছিল, বাবা তো নেই।

ও হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, আর তা শুনে মেয়েটার মুখে কাতর বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠেছিল। কেন তা বুঝতেও পারেনি।

মেয়েটা বলে উঠেছে, ইস, মারা গেছেন?

কি উত্তর দেবে বুঝতে পারেনি। চুপ করে থেকেছে। ছেলেবেলায় কি বোকাই না ছিল, এখন মনে পড়ে। অথচ বাবার নামটা জানত। দাদু মুখস্থ করিয়েছিল। কেউ বাবার নাম জিগ্যেস করলে যাতে বলতে পারে।

মাকে এসে প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ মা, আমার বাবা কি মরে গেছে?

আসলে 'বাবা' শব্দটাই ওর মনে কোনও ধারণা গড়ে তোলেনি। বাড়িতে কেউই রিমির বাবার কথা তুলত না।

মা ওর প্রশ্ন শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, মরে গেছে বলতে নেই।

মরে গেছে না বলে মারা গেছেন বলতে হয় তা শেখানোর কথা মনেই পড়েনি কল্যাণীর। 'মরে গেছে' কথাটা যেন ওকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। অথচ তখন ডিভোর্স হয়ে গেছে। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চকখড়ির সব লেখাজোকা ডাস্টার বুলিয়ে মুছে দিয়েছে। আছে শুধু একটা চাপা রাগ, একটা অদৃশ্য দাগ, যা ভিজে কাপড় দিয়ে বারবার মুছে ফেললেও আবার ফুটে ওঠে। অথচ যার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই নেই সে লোকটা সম্পর্কে 'মরে গেছে' কথাটা শুনতেও খারাপ লাগে। নিজের মনকে বোঝাল, মরে গেলেই তো নিস্তার পাবে। সেই মুক্তি দিতে রাজি নয় কল্যাণী। চরম অপমান করেছে ওকে, শাস্তি পেতে হবে না! বেঁচে থেকে তার দুর্দশা দেখতে চায়, দেখে শান্তি পেতে চায়। যদিও তার কথা এখন আর সারাদিনে একবারও মনে পড়ে না। সারা মাসেও নয়। হঠাৎই তার কথা কেউ বললে, মনে কোনও দাগও কাটে না।

কল্যাণী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, না, মারা যাননি।

—তবে? বাবা কোথায় গেছে? রিমি প্রশ্ন করেছিল।

কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, দূরে, অনেক দূরে। বলব, তোকে সব বলব, আরেকটু বড় হলে।

ইচ্ছে হয়েছিল, তবু সেদিন মাকে আর কোনও প্রশ্ন করেনি রিমি।

কিন্তু তখন ও ছোট ছিল।

মামিমা একদিন বললে, তোর মা যে তোকে কত কষ্ট করে বড় করেছে।

ও প্রশ্ন করতেই বলেছিল, তোর মাকে জিগ্যেস করিস।

সত্যি সত্যি জিগ্যেস করার সাহস হল ওর একদিন।

মাকে এ-সব কথা জিগ্যেস করার সময় কোথায়। মা সব সময়েই ব্যস্ত।

রাত্তিরে মা আর রিমি একই ঘরে শোয়। আগে একই খাটে শুত, গায়ে মার হাতের ছোঁয়া না পেলে ওর ঘুম আসত না। তখন ঘুম আসার আগে কত গল্প হত। কথা বলতে বলতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ত।

একটু বড় হওয়ার পর দাদু এ ঘরে একখানা রোগা খাট ঢুকিয়ে দিয়েছিল। রিমির জন্যেই। মাঝ থেকে রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে চোখ চেয়ে গল্প করার সুরটা কেটে গেল। কথা বলতে হলে দূরের খাট থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে হত কথাগুলো। এভাবে কি গল্প করা যায় নাকি!

কিন্তু কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

ও নিজের খাট থেকে মার খাটে উঠে এল।

— কি রে? কিছু বলবি? কল্যাণী রীতিমত অবাক হয়েছিল। কল্যাণীর হাত ওর গায়ে আদরের স্পর্শ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবে না বলো।

কল্যাণী হাসিমুখে বললে, রাগ করব কেন?

হাসিমুখ তো আর অন্ধকারে দেখা যায় না। তবু গলার স্বরে সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না রিমির। এবং সেই হাসিকে প্রশ্রয় বলেই মনে হল ওর।

দুম করে বলে বসল, আমার বাবা নেই কেন মা?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ধীরে ধীরে কল্যাণী কথায় একটা দীর্ঘশ্বাসের রেশ টেনে বললে, যার বাবা থেকেও নেই ...

থামল, তারপর বললে, তুই কোনওদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না বল।

রিমির শরীরটা চেপে ধরল কল্যাণী।

—কি যে বলো। রিমি হেসে উঠল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমাকে তুমি কিছুই বলোনি। মামিমার কাছে শুনেছি, তুমি অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছ আমাকে। খুব কষ্ট পেয়েছ। কেন মা?

গলার স্বরে কান্না এসে গেল যেন। বললে, কি যে কষ্ট পেয়েছি। তোর ওপরেও তোর বাবার এতটুকু মায়াদয়া ছিল না। সে একটা অমানুষ। তুই তখন সদ্য হয়েছিস, একটা বাজে মেয়ের নেশায় পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

—ইস। শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করল রিমি। কান্নার গলায় বললে, মা, এর চেয়ে বাবা না থাকা ভাল। মরে যাওয়া ভাল।

কল্যাণী বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, আমিই তার মৃত্যু কামনা করিনি, তুই কেন করবি।

কল্যাণী বলতে পারল না, সব জেনেও তার পর দুটো বছর ও শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে এসেছে। হয়তো আশায় আশায়, হয়তো বা বাবা-মা জানলে কষ্ট পাবে ভেবে। তার পর দু বছরের রিমিকে নিয়ে চলে আসতেই হল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, বলল : এরপর তোকে আমি কী-ই বা বলতাম? বাবা আছে?

মানুষ যে এমন হতে পারে ভাবতেই পারল না রিমি। এত ঘৃণ্য? এত নোংরা স্বভাবের মানুষ ছিল তার বাবা!

—বাবা খারাপ, একথা ভাবতেও খারাপ লাগে, না মা?

রিমির মনে পড়ে গেল যখন ছোট ছিল, ওর বন্ধুদের কারও কারও মা ওর দিকে খুব মায়ার চোখ নিয়ে তাকাত। আদর করত। দু-একজনের মা দূর থেকে দেখে হাসাহাসি করে কি যেন বলত। এ-সবই ওর কাছে রহস্য ছিল, কেন মায়া, কেন হাসি, কিছুই বোঝেনি। হঠাৎ সব যেন ওর সামনে রহস্যের দরজা খুলে দিল। নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গেল রিমি। ওর মনে হল আর ও বন্ধুদের সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। সরল বিশ্বাসে আগের মতো 'বাবা নেই' কথাটা উচ্চারণও করতে পারবে না কোনওদিন।

অন্ধকারের মধ্যে মা আর মেয়ে দু'জনেই যেন পরস্পরের কাছে মুখ লুকোতে চাইছে। লজ্জা যেন দুজনেরই। অথচ যে-লোকটা আসল অপরাধী, তার কোনও লজ্জা নেই। কোনও অনুতাপ নেই। শরীরকেই সে সর্বস্ব জেনেছে, জেনে সুখী হয়ে আছে। কল্যাণীর কাছে সেটাই চরম অপমান।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনল রিমি।

মার গলা—ভেবেছিলাম, একদিন অন্তত তোকে দেখতে আসবে। একদিনও আসেনি। তুই কী দোষ করেছিলি বল!

রিমি চুপ করে রইল।

কল্যাণী বললে, কোনওদিন যদি সে তোর কাছে 'বাবা' বলে পরিচয় নিয়ে আসে...

রিমি বিষণ্ণ হাসি হাসল। বললে, 'বাবা' বলে পরিচয় দিলেই কি সে বাবা হয়ে যায় নাকি! আমি তাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

শেষের কথাগুলো আক্রোশের মতো উচ্চকণ্ঠ শোনাল।

বিছানায় অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বললে, অথচ সারাটা জীবন তোকে নিয়ে আমি যে কী ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। ভয়, তোকেও না ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

রিমির হাতখানা চেপে ধরল কল্যাণী। বললে, তুই-ই তো আমার সব, তোর জন্যেই চাকরি। লেখাপড়া কর, বড় হ, তারপর তোর বিয়েটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। তখন আর কোনও ভয় থাকবে না।

রিমি হঠাৎ বলে উঠল, এত সব জানার পরেও ভাবছ আমি বিয়ে করব?

কল্যাণী ওর গায়ে স্নেহ বুলিয়ে দিল।— কেন করবি না। সবাই তো আর আমার কপাল নিয়ে আসে না। তুই তো হিয়ার বাবার কত প্রশংসা করছিলি। সব বাবা কি এক।

একটু থেমে বললে, হ্যাঁ রে, হঠাৎ যদি সে কোনওদিন এসে বলে, আমার মেয়ে আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না তো?

দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠল রিমি। বললে, কি যে বলো মা, আমি তো তাকে চিনিও না, চিনতে চাইও না।

বলেই দু হাত বাড়িয়ে মার অসহায় শরীরটাকে চেপে জড়িয়ে ধরল। মার গায়ে গাল আর চিবুক ঘষতে ঘষতে অস্ফুটে বলতে লাগল, আমার মা, আমার মা, আমার মা।

আর তখনই ওর মনে পড়ে গেল, স্কুল থেকে ফিরে কেডস পায়ে বাড়িতে নিঃশব্দে ঢুকেই অকারণ বসার ঘরের দরজার পরদা সরিয়ে যে লোকটার সঙ্গে মাকে কথা বলতে দেখেছিল, মাকে বেশ অপ্রতিভ লেগেছিল মুহূর্তের জন্যে, সে লোকটা কে? কেন এসেছিল। তার চলে যাবার সময় মা কেনই বা বলেছিল, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন!

কিন্তু সে-কথাটা ওর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, এ প্রশ্নটা করলে মাকে ছোট করা হবে। মনে মনে বললে, আর যাইহোক মাকে কোনওদিন ছোট করতে পারব না।

তিন

রাগে দপ করে জ্বলে উঠেছিল সুবিমল। কিন্তু অক্ষম রাগ। ও জানে এখন আর কিছুই করার নেই। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার যৌবন, নাকি তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, তা ও আজও জানে না। কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কখনও মনে হয় যৌবনের নেশায় ও ভুল করেছিল, কখনও মনে হয় সেই ভুলের স্মৃতিটাই ওকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিজেকে একবারও ওর অপরাধী মনে হয় না। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে সে ওর যৌবন। যৌবনের উন্মত্ত আবেগ, এই কামনা বাসনা, এর কোনওটাই ওর নিজের সৃষ্টি নয়। এরকম পাগলা হাওয়া ওর মাথার মধ্যে, ওর বুকের গভীরে কে রোপণ করেছিল ? সুবিমল তার জন্যে দায়ী হবে কেন !

পরিতোষ এসে বললে, না সুবিমল, ওসব আশা ছেড়ে দে। রাজি হল না, একবারের জন্যেও রাজি নয়।

অথচ পরিতোষকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছে এ খবর শুনে অনেকখানি আশা পেয়েছিল ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

না, সুবিমলের কাছে কল্যাণীর আজ কানাকড়ি দামও নেই। তবু পুরনো দিনের কথা কোনও কোনওদিন মনে পড়ে গেলে বুকেব মধ্যে কোথায় যেন খিচখিচ করে লাগে।

মনে মনে ভাবে, এত দম্ভ কল্যাণী পেল কোথা থেকে। সুবিমলের ধারণা ছিল, একবার ও কল্যাণীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই সে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে।

পরিতোষ বললে, কি বলল জানিস ? আমি দিব্যি শান্তিতে আছি, অশান্তি চাই না।

রাগে দপ করে জ্বলে উঠেছিল সুবিমল। কল্যাণীর বিশুষ্ক উদভ্রান্ত মুখখানা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই অসহায় মুখখানার আড়ালে যে এতখানি দম্ভ থাকতে পারে, ভাবেনি কোনওদিন।

—তুমি তো একটা দুশ্চরিত্র লম্পট। আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিলে। উন্মত্ত আক্রোশে চিৎকার করে উঠেছিল কল্যাণী।

সেই কথাগুলোই যেন আবার কানের পাশে বেজে উঠল।

অথচ সেদিন ওর মনের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি। কিংবা একটা চাপা ক্রোধ বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠেছিল।

সুবিমলের মনে হয়েছিল কোনও অন্যায়ই করেনি ও।

পরিতোষ ওকে বোঝাতে চাইত।—কল্যাণীকে তুই বিয়ে করেছিস, তারপরও এ-সব কী করছিস তুই ?

নির্বিকার মুখে সুবিমল বলেছে, রঞ্জনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভালবাসতাম।

পরিতোষ হেসে উঠে বলেছে, ভালবাসা ? তোর এই নেশাটাকে আর যাই বল, ভালবাসা বলিস না। এর নাম সেক্স। ওর শরীরটার ওপর তোর লোভ।

—হতেও পারে। বাট সেক্স ইজ নো ক্রাইম। মানুষের শরীরেই থাকে।

হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেছে পরিতোষ। যে মানুষটা নিজের ভুল বুঝতে পারে না, তাকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না। তবু বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। বন্ধু বন্ধুই থেকে যায়, সে দোষ করলে, অন্যায় করলেও। পরিতোষের মনে হয়েছে আমি তো বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করছি না। নাকি বিবেক হয়ে দাঁড়াতে চাইছি সুবিমলের ওপর গোপন ঈর্ষা আছে বলে। রঞ্জনার শরীরের ওই চটক, ওটাই হয়তো ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছে।

সুবিমল বললে, তুই জানিস না পরিতোষ, আমি রঞ্জনাকে ভুলতেই চেয়েছিলাম।

তারপরই ও যেন নিজেকে প্রশ্ন করল, ভুলে যাবার জন্যে, নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ভাল করে মনেও পড়ে না। হয়তো ব্যর্থতার জ্বালা নেবাতে পারবে এই আশায়। বুকের শূন্যতা দূর করতে চেয়েছিল, হয়তো ভেবেছিল আরেকজনের ভালবাসা পেলেই ওর জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কলেজে পড়ার সময়েই ওদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ভালবাসার না বন্ধুত্বের সেটুকুই বুঝতে পারেনি। রঞ্জনার বন্ধুত্ব শুধু সুবিমলের সঙ্গেই ছিল না। ওরা তিন-চারজন বন্ধু সব সময়েই রঞ্জনাকে ঘিরে থাকত। ওদের হাসি হল্লা আড্ডার মধ্যে সকলের কথায় ব্যবহারে কোথায় যেন একটা লুকোনো স্তাবকতা থাকত। আর সেই স্তাবকতা রঞ্জনা যেন বেশ উপভোগ করত।

সুবিমল অরুণ নীলাদ্রি সকলেই তখন মোহগ্রস্ত। অথচ প্রত্যেকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করত কোনও বিশেষ একজনের প্রতি রঞ্জনার

কোনও আগ্রহ বা দুর্বলতা আছে কি না। নিঃসন্দেহ হতে পারেনি বলেই কেউ সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেনি। রঞ্জনাও কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছে বলে মনে হয়নি, কারণ হাবেভাবে কথাবার্তায় ও এক-একদিন এক-একজনকে প্রশ্রয় দিত। আর সে জন্যেই কেউ কারও প্রতি ঈর্ষা বোধ করত না।

বরং এক-একসময় মনে হত, ওদের যে কোনও একজনের সঙ্গে যদি রঞ্জনা জড়িয়ে পড়ে, তা হলেই যেন শান্তি পায়। তখন বাকি কয়েকজন নিশ্চিন্তে স্বপ্নের ঘরে চাবি দিয়ে দিতে পারবে।

একদিন রঞ্জনা তখনও আসেনি। ওরা জনাচারেক বন্ধু শুকনো মুখ করে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে, কথায় কার্পণ্য সকলেরই। রঞ্জনা সামনে না থাকলে ওদের কথাগুলোর কোনও দাম আছে বলে মনেই হত না।

নীলাদ্রি অরুণকে বললে, তুই সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়, দেখিস না তোর কথা শুনে কী দারুণ এনজয় করে।

সুবিমল হেসে উঠে নীলাদ্রিকে বললে, সেদিন চিড়িয়াখানার কথা উঠতে তোর দিকে তাকিয়েই বললে, যাবি? কই আমাদের দিকে তো তাকায়নি।

ও হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু সেদিন সুবিমলের ভেতরটা কেঁদে উঠেছিল। তা না হলে কথাটা ওর মনে পড়ল কেন।

অরুণ বলে উঠল, দ্যাখ সুবিমল, আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করিস না। তুই-ই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস কি না কে জানে।

ঠিক সেই সময়েই রঞ্জনা ঢুকল, সাদা চামড়ার ব্যাগটা কাঁধের স্ট্র্যাপ থেকে কোমরের বেশ কিছুটা নীচে অবধি ঝুলছে।

সটান সামনে এসে বললে, আঃ, আমাকে দেখতে পেয়ে তোদের মুখগুলো কী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখলাম, কার মুখ সবচেয়ে উজ্জ্বল হল।

—কার? কার?

সকলেই প্রশ্ন করে উঠল।

নীলাদ্রি বললে, নিশ্চয় আমার।

অরুণ বললে, উঁহু, আমার। মানে আমার নয়, আসলে তোর মুখটাই আমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল তো, তারই রিফ্লেকশন।

সুবিমল কোনও কথাই বলেনি। তা দেখে রঞ্জনা বললে, কিরে, অভিমান নাকি!

কলেজ শেষ হতেই সেই রঞ্জনা কোথায় যেন ছিটকে গিয়েছিল।

দু-একদিন ফোন করে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিল। কোনও উৎসাহ দেখায়নি ও, কোনও প্রশ্রয় ছিল না তার কথায়।

সুবিমলের বুকের মধ্যে তখন অসীম শূন্যতা। যে কোনও একজনকে আঁকড়ে ধরার জন্যে ও তখন ব্যস্ত। ভেবেছিল তা হলেই শূন্যতা দূর হয়ে যাবে। কিংবা ভেবেছিল, বিয়ের চিঠিটা নিয়ে গিয়ে রঞ্জনাকে দিয়ে আসবে। চিঠিটা দেখে রঞ্জনার মুখের ভাব কেমন হয় দেখবে। কারণ সুবিমল সাহস করে কোনওদিন কিছু বলতে না পারলেও ভেতরে ভেতরে ওর কেমন একটা বিশ্বাস ছিল, রঞ্জনা ওকেই ভালবাসে।

সুবিমলের মনে হয়েছিল কল্যাণীকে বিয়ে করে ও আসলে রঞ্জনার ওপরই রিভেঞ্জ নিয়েছে। যদিও শেষ অবধি বিয়ের চিঠিটা পাঠাতেও ইচ্ছে হয়নি।

সেই রঞ্জনার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটে। কি সব কেনাকাটা করে রঞ্জনা ঘর্মাক্ত, হাতে বড় একটা পেট-ফাঁপা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

—আরে সুবিমল তুমি!

বলেই বাঁ হাতটা বাঁদিকের বুকে চেপে বললে, দাঁড়াও, প্যালপিটেশন সামলে নিই।

সুবিমল ঠিক বুঝতে পারল না। কিংবা সঙ্কোচ বোধ করছিল। রসিকতা উপভোগ করতে পারল না।

শান্ত গলায় বললে, আছ কেমন?

উত্তর এল, ফাইন। অ্যাজ ফ্রি অ্যাজ আ ফ্লাইং বার্ড।

রঞ্জনার কথা শুনে ও প্রথমটা ধরতে পারেনি। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হয়েছিল, আমরা কি পরস্পরকে 'তুমি' বলতাম? নাকি 'তুই'! মনে পড়েছিল, তবু আজ আর 'তুই' বলতে পারল না। মনে হল, এই কটা বছরে ওদের মধ্যে যেন অনেকখানি দূরত্ব গড়ে উঠেছে।। আজ আর সেই পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবু রসিকতার স্বরে বললে, কই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন? ফ্যাশন?

কলেজ ছাড়ার পর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সকলেই একে একে কেমন বদলেও গেছে। সেই উদ্দাম উত্তেজনা, উৎফুল্ল আনন্দ, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর দিন কারই বা আছে। সুবিমল নিজেও অনেক বদলে গেছে। এখন ধীরস্থির সংসারী মানুষ হবার চেষ্টা করছে। সেটাই স্বাভাবিক।

সুবিমল একাই নয়, নীলাদ্রি আর অরুণও ভাল চাকরি জুটিয়ে

নিয়েছে। এক-এক জন এক-এক লাইনে, যার সঙ্গে ছাত্রদিনের রুচি কিংবা স্বপ্নের কোনও সম্পর্কই নেই। চাকরিটা পেয়ে সুবিমল যেমন খুশি হয়েছিল তেমনি মনমরাও। টাকার অঙ্কটা লোভনীয় ঠেকেছিল। কিন্তু ওই অবধি। মনকে বুঝিয়েছিল, আমরা যারা কলেজ থেকে বের হই, কেউ নাটও নই, বল্টুও নই। পরিমাণ মতো গলানো লোহা। যদি কেউ বলে কয়েকটা নাট দরকার, আমরা নিজেদের ঢালাই করে নিয়ে নাট বনে যাই। কেউ বল্টু চাইলে বল্টুও হয়ে যাই।

খোলাবাজারের চাহিদা কী সেটারই খোঁজ রাখি। নিজের চাহিদা শুধু টাকার অঙ্কে। যে টাকা রুচি বা স্বপ্ন দিতে পারে না।

নীলাদ্রি এবং অরুণও তাই। চাহিদামতো নিজেদের বদলে বাজারের চাহিদা মিটিয়েছে। তারপর বিয়ে, সংসার।

মাত্র কটা বছর, তারই মধ্যে মানুষ কত বদলে যায়।

তিন বন্ধু একবার একত্র হয়েছিল এই সেদিনও। আড্ডা তেমনভাবে জমেনি। সকলের মুখেই অফিস আর অফিস পলিটিক্স, সংসার আর সংসারের বিরক্তি বা যন্ত্রণা, তারপর হঠাৎ একসময় দমকা হাওয়ার মতো রঞ্জনার কথা উঠেছিল। তিনজনই খুব হেসেছিল, কী বোকা ছিলাম রে আমরা, ভাবতাম আমাদের মধ্যে কাউকে ভালবাসে ও। নীলাদ্রি প্রতিবাদ করেছিল, ধুস, আমি তা কোনওদিন ভাবিনি। অরুণ বলেছে, ফ্রেন্ডের বেশি ভাববই বা কেন। সুবিমল বলেছে, তাই হবে, শরীরে চটক ছিল ওর, দেখতে কথা বলতে ভাল লাগত এই অবধি।

ওরা তিনজনই একই সিদ্ধান্তে এসেছিল, ওরা কেউ রঞ্জনার প্রেমে পড়েনি।

সেই রঞ্জনার সঙ্গে সুবিমলের দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটে। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, কি সব কেনাকাটা করেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু ঠিক আগের দিনে পৌঁছে যেতে পারছিল না। রঞ্জনা ইতিমধ্যে যেন একটু মোটা হয়েছে, তেমন স্লিম নেই। যার ফলে কিছুটা চাপল্য ঝরে গেছে, কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর। অন্তত সুবিমলের তাই মনে হল।

কথার পিঠে কথা, হঠাৎ বললে, কই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন? ফ্যাশন?

কলেজ ছাড়ার পর ওরা তিন বন্ধু একদিন একমত হয়ে বলেছিল, মেয়েটা নির্ঘাত পাড়ায় কারও সঙ্গে প্রেম করত।

নীলাদ্রি বলেছিল, লাভার নিশ্চয় ছিল, কোনওদিন জানতে দেয়নি।

অরুণ বলেছে, আমরা শালা আঁটি চুষে ভেবেছি আম খাচ্ছি।

আসলে তিনজনের মনেই হয়তো একটা ঝাল ছিল। সেটা অশ্লীলতা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

হো হো করে সারা শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল না রঞ্জনা। এ ক'বছরে একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে বলেই, নাকি বয়েস বেড়েছে বলে, চোখে একটা রহস্য এনে স্মিত হাসি আঁকল ঠোঁটের কোণে। রঞ্জনা বললে, সাদা সিঁথিটা বিজ্ঞাপনও তো হতে পারে, তোমার জন্যে আজও অপেক্ষা করে আছি, তার বিজ্ঞাপন।

মনে পড়ছে, তখন 'তুই' বলত পরস্পরকে। রঞ্জনা 'তুমি' দিয়ে শুরু করেছিল বলেই কেমন দূরত্ব বোধ করেছিল। মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল, আমরা কি 'তুমি'ই বলতাম ?

কিন্তু সেই আগের দিনে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই দূরত্বটা যেন আরও মধুর, আরও মোহময়।

একটু রহস্য রয়ে গেল, রঞ্জনা সত্যিই এখনও বিয়ে করেনি, নাকি যারা চুলের ফাঁকে সিঁদুরটুকু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তাদের মতোই আধুনিকা !

ওরা কথা বলতে বলতে বাইরে বেবিয়ে আসছিল, দেখল বাইরে ঝকঝকে আলো মেশানো বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি দেখে, নাকি চলে যেতে ইচ্ছে ছিল না বলে, কে জানে, রঞ্জনা বললে, চলো, ততক্ষণ বরং কোথাও বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

রঞ্জনা এক্ষুনি চলে যাবে ভেবে সুবিমলের ভিতরটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল, একান্ত গোপনে, রঞ্জনার কথায় ও যেন প্রাণ ফিরে পেল।

বললে, তাই চলো, আরও কিছুক্ষণ তো তোমাকে কাছে পাব।

বলে হাসল, যাতে রঞ্জনা কথাটাকে উপহাস বা রসিকতা ভেবে নিতে পারে। কারণ ওটা যে ওর বুকের ভেতরের কথা তা বুঝতে পারলে রঞ্জনা হয়তো ব্লাউজের হাতা থেকে টুসকি দিয়ে একটা নোংরা পোকাকে ছিটকে দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠবে এই ভয়ে।

কতক্ষণ, কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছিল সুবিমলের ধারণাই ছিল না।

কথা কথা কথা। নানা বিষয়ে কথা বলে গেল রঞ্জনা। আর সুবিমল মুগ্ধ শ্রোতার মত মোহগ্রস্ত মন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে গেল।

ওর মনে হল পুরনো দিনের সেই গোপন ভালবাসা আবার যেন ডানা মেলতে চাইছে। ভালবাসা, না শরীরের প্রতি লোভ ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। আর বুঝতে পারলেও দুটোব মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে বলে মনে হল না। দুটোই তো সমান নেশা জাগায়। দুটোই শেষ অবধি

একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। শুধু একটা জায়গায় ওর মনে হল, ও কপটতা করছে। অন্যায় করছে। কারণ শেষের দিকে ওর সন্দেহ হচ্ছিল, রঞ্জনাও ওর সঙ্গ চাইছে। সান্নিধ্য চাইছে।

স্বপ্ন ভেঙে যাবে এই ভয়ে ও কিছুতেই বলতে পারছিল না, যে ও বিবাহিত।

কল্যাণীর কথা ও একবারও বলতে পারল না। বলতে পারল না, দুদিন বাদেই ও সন্তানের পিতা হবে।

সেই শুরু।

বাড়ি ফিরে সেদিন ওর নিজেকে ভীষণ অস্থির লেগেছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় দোলা ফুলবাগানের মতো অস্থির অথচ সুন্দর। একটা স্বপ্নময় সুগন্ধ যেন ওর সারা শরীর জুড়ে কুঁড়ি থেকে পটপট করে ফুল ফোটাচ্ছিল।

বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী প্রচণ্ড রেগে গেল।— তোমার না আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা! আমি কখন থেকে তৈরি হয়ে আছি ...

সব আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল। সমস্ত মন জুড়ে শুধুই বিতৃষ্ণা। কল্যাণীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছিল না। কী কদর্য দেখতে হয়েছে।

সুবিমল নিজেই অবাক হয়ে গেল, বুঝতে পারল ওর মধ্যে প্রচণ্ড কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে। তা না হলে কল্যাণীকে এত কুৎসিত মনে হচ্ছে কেন।

মনে পড়ল, সকালে অফিসে বেরোনোর সময়েও ও কেমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখেছে কল্যাণীর এই শরীরটাই।

সন্তান-আসন্না স্ফীতোদর কল্যাণীর পেটে রসিকতা করে হাত বুলিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে কল্যাণী।

কল্যাণীর রাগ পড়ে গেল একসময়। কিন্তু রঞ্জনার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে এ কথা বলতে পারল না। যে রঞ্জনার কথা ও কখনও কখনও বলেছে, কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে।

তারপর কীভাবে যেন সুবিমল আর রঞ্জনা বিদ্যুতের গতিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরম অন্তরঙ্গ।

তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, দ্বিতীয় দিনেই ও আর কল্যাণীর কথা লুকিয়ে রাখতে চায়নি।

—আমার একটা বউ আছে, তোমাকে বোধহয় সেদিন বলাই হয়নি। কফি খেতে খেতে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সব ভুলেই গিয়েছিলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনা বলে উঠেছে, ওয়ানডারফুল। কবে বউকে দেখাবে বলো ? আজই ?

সুবিমল হেসে উঠল। — আরে না না, আজ নয়। আর একদিন।

পরিতোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। পরিতোষের নিজেরই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল রঞ্জনাকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে।

পরের দিন বললে, দেখিস, ও তোর মাথা চিবিয়ে খাবে।

—বলছিস ? সত্যি ? তা হলে, আমি ভাবব, আয়াম দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ।

তারপরই বলেছে, কোনওদিন যেন কল্যাণীকে বলে বসিস না।

পরিতোষ যত আদর্শবাদীই হোক, এ ব্যাপারে বন্ধুদের মধ্যে একটা অলিখিত আঁতাত আছেই। কেউ কারও সাময়িক পদস্খলনের কথা কারও সহধর্মিণীর কানে তোলে না। ঈর্ষা তাকে শত্রু করে না তুললে।

কপট বিষণ্ণ মুখ করে সুবিমল একদিন রঞ্জনাকে বললে, বড্ড লেট করে ফেললাম।

রঞ্জনা হাসল। বললে, একবার প্রোপোজ করে তো দেখলে পারতে। না হয় রিফিউজ করতাম, তাতে জীবন তো আর বরবাদ হয়ে যেত না।

একটু থেমে বললে, এখনও সময় আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার।...প্রোপোজ করোনি কেন ?

—সাহসই হয়নি।

রঞ্জনার ঠোঁটে ওটা কি কৌতুকের হাসি ?

বললে, আমার অত সব জেলাসি নেই। হেসে উঠে বললে, অবৈধ প্রেম, তার মত গ্র্যান্ড কিছু আছে নাকি !

সেই দিনই রঞ্জনাকে ও বাড়িতে নিয়ে গেল। নিয়ে যেতে সাহস পেল হয়তো।

—কল্যাণী, এই সেই রঞ্জনা। কলেজের বন্ধু। নীলাদ্রি আর অরুণের কাছে আগেই শুনেছ।

কল্যাণী হেসে বললে, এসো ভাই। একটু থেমে বললে, ওর মুখেও তোমার কথা কম শুনিনি।

কল্যাণী খুব আদর আপ্যায়ন করল। একেবারে আপনজনের মতো। যেন কতদিনের আলাপ পরিচয়। — তুমি তো বলতে গেলে

ঘরের লোকের মতো।

সুবিমল খুব খুশি হয়েছিল। যাক, কল্যাণীর মনে কোনও হিংসে নেই। কি ভাল, কি ভাল।

রঞ্জনা চলে যাওয়ার পরই কল্যাণী হাসতে হাসতে বললে, একদিন বেড়াতে নিয়ে এসেছ, ঠিক আছে। ঘরে এনে তুলো না যেন কোনওদিন।

চার

অন্ধকার রাতের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা আর মেয়ের মধ্যে আড়াল সরে গিয়েছিল। একে একে সব শুনেছে রিমি। আর পনেরো থেকে আঠারোয় পৌঁছতে পৌঁছতে কল্পনা দিয়ে সব ফাঁকা জায়গাগুলো ভরিয়ে নিয়েছে।

এখন রিমির মধ্যে শুধুই একটা চাপা আক্রোশ। বাবা সম্পর্কে তিক্ত বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নেই। কিংবা তাও নয়। ওর জীবনে, ওর মনের মধ্যে বাবা নামক কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বই ও বুঝতে পারে না।

মা বলেছিল, ও একটা উপদ্রব।

বলেছিল, আমি ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

রিমি তা জানে।

ছেলেবেলায় কে কোথায় রিমিকে দেখে উপহাস করেছে, কিংবা মায়া মাখানো চোখে দূর থেকে 'আহা আহা' করেছে, রিমি টেরও পায়নি। কারণ তখন ও কিছুই জানত না। কিন্তু মার কাছ থেকে শোনার পর অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওকে পেয়ে বসল। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

রাস্তায় বের হলেই ওর মনে হত সকলেই ওকে তাকিয়ে দেখছে। ও বয়সের মেয়েরা রাস্তায় বের হলেই বুঝতে পারে রাজ্যের লোক তাকিয়ে দেখছে। কেন দেখছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কোনও কোনও দৃষ্টি হয়তো বিব্রত করে কিংবা অপমান করে। কিন্তু প্রথম প্রথম রিমি সেটুকু বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ওনি। ওর কাছে সব দৃষ্টিই ছিল অবমাননার দৃষ্টি। সে অবমাননা ওর রূপ যৌবন বা শরীরের প্রতি নয়।

নাইন-টেনে পড়ার সময় কোনও কোনও সহপাঠী মেয়ে আবার দু-একজন কিশোর বা কৈশোর পার হওয়া যুবকের দৃষ্টিতে মজা পেয়েছে। কৌতুক বোধ করেছে, হাসাহাসি করেছে নিজেদের মধ্যে। কেউ কেউ তাদের চোখের চাউনির মধ্যে নিজের রূপের প্রতি নৈবেদ্য, স্তুতি কিংবা স্তবের ইঙ্গিত পেয়েছে। খুশি হয়েছে।

রিমির জীবনের সেই স্বর্ণময় দিনগুলোই আসেনি। ও যেন শৈশব থেকে একেবারে যৌবনে পৌঁছে গেছে।

—জানো মা, এত খারাপ লাগে। কেউ হাসলেই মনে হয়, বোধহয় সব জানে বলেই হাসছে। কেউ তাকালে মনে হয়, আরও কিছু জানতে চাইছে।

কল্যাণী বলেছে, তা হলে ভেবে দেখ, আমাকে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

বলেছে, যখন চলে এলাম এ-বাড়িতে, পাড়ার লোক, এমনকি আত্মীয়স্বজনরাও ভেবেছে আমারই দোষ। সব দোষ তো চিরকাল মেয়েদেরই। আমারও মনে হত সবাই যেন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

চুপ করে থেকেছে রিমি। ওর ভিতরটাও নড়ে উঠেছে মার কথা শুনে। তবু অনুভবে বুঝতে পারেনি মার কষ্ট। ভাবতে চেষ্টা করেছে, মা কি আমার মতোই হাসি দেখলেই উপহাস ভাবত, কিংবা দৃষ্টিকে ভেবেছে কৌতূহল।

কল্যাণী বললে, এখন আর কাউকে ভয় পাস না, কে কি ভাবল, কে কি বলল, তার তোয়াক্কা করবি কেন!

একটু থেমে, এখন তো আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, মাথা তুলে হাঁটি। এখন আর কাকে ভয়!

কল্যাণী ধীরে ধীরে বলেছে, যখন ছোট ছিলি, তখন আমার কী ভয়, তোকে না শেষ অবধি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তা হলে কি নিয়ে যে বাঁচতাম।

এত দুঃখের কথার মধ্যেও হেসে উঠেছে রিমি। বাঃ—রে, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মানে? আমার নিজের কোনও মত নেই? নিয়ে যেতে চাইলেই আমি যেতাম?

কল্যাণী হেসেছে।—তা তো জানি, জানতাম, তবু।

আসলে উত্তরটা দিতেই পারেনি কল্যাণী। বলতে পারেনি, রিমির নিজের মতটাকেই তো ভয় পেয়ে এসেছে। সেই মত যে মুহূর্তে বদলে যাবে না সেই বিশ্বাসই ছিল না।

'বাবা কোথায়' বা 'বাবা নেই কেন' এ-সব প্রশ্ন শুনে কল্যাণীর ভিতরটা অবধি থরথর করে কেঁপে উঠত। 'বাবা' শুধু একটা শব্দ। একটা নাম। তাকে কখনও চোখেও দেখেনি রিমি, একটা দিনের জন্যেও আদরের স্পর্শ পায়নি, তবু কি আশ্চর্য, শুধু ওই শব্দটা ওকে এত টানে। না জানি, হঠাৎ একদিন এসে যদি হাজির হয়, হাসি হাসি মুখ করে আদরে জড়িয়ে ধরে বলে বসে, 'আমি তোমার বাবা,' কল্যাণীর ভয় ছিল, তা হলে হয়তো ওর সমস্ত পৃথিবীটা তোলপাড় হয়ে যাবে। আরও একবার ওর

পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। মানুষটাকে তো কল্যাণী দেখেছে, ও সব পারে, অমন দক্ষ অভিনেতা জীবনে আর একজনকেও দেখেনি। শুধু কল্যাণীকে আরেকবার মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্যে সেটুকু অভিনয় ওই পাষণ্ডটা অনায়াসে করতে পারে।

কল্যাণী বললে, জীবনে কোনওদিন যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা কথা বলে, বাবা বলে যেন স্বীকার করিস না। কথাও বলবি না।

—কি যে বলো, ওই রকম একটা মানুষকে বাবা বলতে আমার ঘেন্না করবে।

শুনে কল্যাণীর মুখটা হেসে উঠল, আনন্দে।

একে একে প্রায় সব কথাই ও বলেছে রিমিকে। ওর যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা, প্রতিটি দিনের কথা।

বলতে বলতে পুরনো দিনগুলোর কথা মনেও পড়ে যায়।

ছোটমামা বলছে, একটা লোককে জব্দ করার জন্যে তুই তো নিজেকে জব্দ করছিস। ওই নচ্ছার মেয়েটা কি বিয়ের তোয়াক্কা করে নাকি।

কৌতুকের ভঙ্গিতে বলেছে, কাকে 'রক্ষিতা' অপবাদ দিয়ে অপমান করতে চাস, ওই শব্দটাই তো ডিকশনারি থেকে উঠে যাচ্ছে। এখন লিভ টুগেদারের যুগ।

হাসতে হাসতে বলেছে, ওটা এখন দারুণ ফ্যাশন।

কল্যাণীকে কেমন হতাশ দেখিয়েছে। ওর হাতে একটাই অস্ত্র ছিল প্রতিশোধ নেবার। হঠাৎ হাতের মুঠোটা খুলে দেখেছে কোথাও কোনও অস্ত্র নেই। ছুঁড়ে মারবার মতো একটা পাথরের টুকরো ছিল, সেটুকুও কোন জাদুতে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দিনকয়েক পরে ছোটমামাকে বলেছে, তা হলে অক্ষয়কাকাকেই বলো। একটাই অনুশোচনা, বাবাও চেয়েছিল কল্যাণী ডিভোর্স করে নতুন জীবন শুরু করুক। সেই বাবাও তখন মারা গেছেন।

ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন, সকলেই বলল, হার্ট অ্যাটাক।

হার্টের কোথায়, শুধু কল্যাণীই জানে। প্রথম, যেদিন দু বছরের রিমিকে কোলে নিয়ে এ-বাড়িতে ফিরে এল। দ্বিতীয়, যেদিন বাবা অক্ষয়কাকাকে সঙ্গে নিয়ে এল, কিন্তু ও ডিভোর্স নিতে চাইল না।—ডিভোর্স? কি বলছ তুমি, এত সহজে আমি ওকে রেহাই দেব! সুখের পায়রাকে পুষে ও কদিন সুখে থাকে দেখি না! থার্ড কোনটা? সেই টেলিফোনের কথা কি?

রিমিকে সব বলেছে, ওই টেলিফোনের কথাটা বলতে পারেনি। বলতে চায়নি। রিমির সম্পর্কে যে ওর বাবার কোনওদিন কোনও আগ্রহ

হয়েছে তা জানতে দিতে পারেনি, ভয় পেয়েছে। বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল।

বি এড পড়তে পড়তেই পড়া ছেড়ে দিতে হল।

অক্ষয়কাকা একদিন এসে বললে, কল্যাণীর একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। আমার এক মক্কেলকে বলেছি। বড় কোম্পানির জি এম। তার একটি মাত্র মেয়ে।

অক্ষয়কাকা বাবাকে সান্ত্বনা দেবার গলায় বললে, মেয়ের বাপ না হলে মেয়ের বাপের দুঃখ কে বুঝবে। সব শুনে বলেছে, আই উইল ফিক্স হার আপ সামহয়্যার।

অক্ষয়কাকা কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছে, কি রে, পেলে করবি তো ?

সম্মতিতে ঘাড় নেড়েছে কল্যাণী। খুশি হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কাকাকে মনে হয়েছে দেবতা।

বাবা বলেছে, ডিভোর্সটা এবার তা হলে করেই নে।

তখনও একগুঁয়েমি যায়নি। কেন দেব ডিভোর্স !

সেই দুশ্চিন্তাতেই বাবা মারা গেল কি না কে জানে। নাকি সেই টেলিফোন।

সুবিমলের কথা বেবাক ভুলেই গিয়েছিল কল্যাণী। রাগ স্তিমিত, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেও হয় না। মনে হয় যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি।

একদিন মিনিবাসে অফিস থেকে ফিরছে। হঠাৎ পরিতোষবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখতে পেয়েই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল। ও জানালার ধারে বসেছিল, রড ধরে ধরে পরিতোষবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল, যেন জানালার বাইরের দৃশ্য দেখছে।

পরিতোষ মাথাটা ঝুঁকিয়ে : আরে বউদি যে। কোত্থেকে ?

মুখ ফেরাতেই হল। হাসতে হল। মাঝখানে বারো-তেরোটা বছর পার হয়ে গেলেও অচেনার ভান করা গেল না।

—এদিকে কোত্থেকে ? আবার প্রশ্ন।

কল্যাণী হেসে বললে, অফিস থেকে।

পরিতোষবাবু বেশ অবাক।—কোন অফিস ?

মুখ ফসকে নামটা বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই মনে হল, নামটা না বললেই ভাল ছিল। একটা অন্য নামও তো বলতে পারত।

কল্যাণীর পাশের লোকটা তখনই উঠে গেল, আর ধপ করে ওর পাশেই বসে পড়ল পরিতোষবাবু।

—মেয়ে কত বড় হল, কী পড়ছে ?

কল্যাণী ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। এড়িয়ে এড়িয়ে উত্তর দিল।

তবু লোকটা নাছোড়বান্দা। সুবিমলের খবর জানাতে যাচ্ছিল, কল্যাণী হঠাৎ উঠে পড়ল। টিকিটের পয়সাটা নষ্ট হয় তো হোক।

বললে, এখানেই নামব।

হুড়মুড় করে ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এল, নেমে পড়ল পরের স্টপেই।

লোকটা কী ভাবে কী! সুবিমলের কোনও খবর জানার জন্যে আগ্রহ আছে ওর এখনও?

হপ্তাখানেক বাদেই, অফিসে বসে আছে, কে একজন বললে, কল্যাণীদি, আপনার ফোন।

ফোন? ও একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওকে কে ফোন করবে?

ও প্রান্ত বললে, আমি সুবিমল বলছি।

হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না কল্যাণী।

সুবমিল শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দটা শুনতে পেল।

—শুনলাম পরিতোষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল।

কল্যাণী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, হতেই পারে।

সুবিমল একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, একদিন যাব? মেয়েকে একবার দেখে আসব শুধু।

কোনও উত্তর না দিয়ে ঝপাং করে রিসিভারটা নামিয়ে দিল কল্যাণী। লাইন কেটে গেল।

ওর বুকের ভেতরটা তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। অসীম বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি যেন পেটের ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে চাইল। একটা দুশ্চিন্তা, একটা আতঙ্ক, কল্যাণীকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল।

—হীরুদা, শরীরটা ভাল লাগছে না, বাড়ি চলে যাব?

প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বাস ধরল ও। বাড়ি ফিরে যেতে পারলে যেন নিশ্চিন্তি। যেন এক্ষুনি এসে ওই লোকটা রিমিকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। সেদিন রিমি স্কুল থেকে ফিরে না আসা অবধি কী উদ্বেগ। কী দুশ্চিন্তা।

বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোন। কনকনলিনী সোনা ফ্রেমের চমশা চোখে দিয়ে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

কনক সদর দরজার খিল খুলে দিয়ে অবাক হলেন।— তুই, এ সময়? শরীর খারাপ নাকি!

—না, এমনি চলে এলাম।

কনক বললেন, দেখিস, নতুন চাকরি।

বাবা ঘুম থেকে ওঠার পর কল্যাণী টেলিফোনের কথাটা বললে। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলছিল।

বাবার মুখেও দুশ্চিন্তা নামল। বললেন, তখনই বলেছিলাম ডিভোর্সটা নিয়ে নে। এখন কি যে করি। মনে হচ্ছে জ্বালাবে।

কনক বললেন, হঠাৎ এত বছর বাদে মেয়ের জন্যে দরদ উথলে উঠছে।

বাবা বলল, স্কাউন্ড্রেল। দেখি অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলে।

পরের দিন থেকে অফিসে বসে কী অশান্তি। এই বুঝি আবার ফোন এল। আবার কথা না বলে কেটে দেওয়া। আশপাশের লোকরাও তো দেখবে। কী ভাববে তারা। ফোন বেজে ওঠার শব্দটা যেন আতঙ্ক। অন্যের টেবিলে ফোন, তবু রিং হলেই ওর কান উৎকর্ণ হয়ে থাকে, এই বুঝি ডাক এল, কল্যাণীদি আপনার। অন্য কেউ কথা বলতে শুরু করলে তবেই নিশ্চিন্ত হয়।

এ অফিসে ওর দুঃখী জীবনের কথা, লজ্জা আর অপমানের কথা একমাত্র জি এম জানেন। তাঁর সঙ্গে ওর একদিনই দেখা হয়েছিল। অক্ষয়বাবু যেদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সে-সব পুরনো জীবনের কথা উনি কি আর অন্য কাউকে বলেছেন! এত ওপরে তিনি, এরা কেউ তাঁর নাগালই পায় না। খোদ জি এম ওকে চাকরি দিয়েছেন এ-কথাটাই কেউ জানে না। জানলে কেউ না কেউ বলত। আর এত তুচ্ছ একটা অধস্তন চাকরি জি এম দিতে পারেন সে-কথাই কেউ ভাবতে পারে না।

কল্যাণী যে বিবাহিত সে-খবর কেউ জানে না। কারণ দু বছরের রিমিকে কোলে নিয়ে যেদিন ও চলে আসে, তারপর একদিনও সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়ায়নি।

এখন এই স্কাউন্ড্রেলটা যদি সব রাষ্ট্র করে দেয় অফিসে, সেও এক আতঙ্ক।

সে আতঙ্ক বাবারও ছিল, মারও। যেদিন রিমিকে নিয়ে চলে আসে সেদিন থেকেই।

কনকনলিনী দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, পুরুষদের হাতে একটাই অস্ত্র, বউ ছেড়ে চলে গেছে, কিংবা বউকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ ওর স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। খারাপ, খারাপ। ওই একটা কথাই চিরকাল শুনে এসেছি, মেয়েদের মুখেও। মেয়েরা খারাপ।

অফিসে আবার টেলিফোন আসতে পারে, এই এক ভয়। আর এক ভয় রিমিকে নিয়ে। বড় হচ্ছে। এমনিতেই তো সব সময় একটা

আশঙ্কা, ভুল পথে না চলে যায়। চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে বের হলে সে মেয়ে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সরল শান্তশিষ্ট মুখ করে এমন ভাবে ফিরবে, দেখে এতটুকু সন্দেহ হবে না। হাঁসের গা দেখে কি বোঝা যায় একটু আগেই জলে সাঁতরে এল।

সে ভয় সব মায়েরই থাকে।

কিন্তু কল্যাণীর অন্য এক ভয়। বিশেষ করে ওই টেলিফোনটা আসার পর থেকে।

তা কেন, পরিতোষের সঙ্গে বাসে দেখা হওয়ার পর থেকে। অফিসের নামটা বলে ফেলে কী ভুল যে করেছিল। ঠিক খবর নিয়ে নিয়ে ডিপার্টমেন্ট বের করে ফেলেছে! হয়তো অপারেটরই বলে দিয়েছে।

কল্যাণী ছোটমামাকে বলেছিল, জানো, ছোটমামা, ওর এক বন্ধু, পরিতোষ, সুবিমলের কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি না শুনে সেই স্টপেই নেমে পড়লাম।

—ইস। ছোটমামা বলে উঠেছে।— সব শুনলি না কেন, সেই উইচ, মানে ডাইনিটার ক'টা ছেলেমেয়ে, কোথায় পড়ে।

—তাতে আমার কী যায় আসে। ওসব শোনার আগ্রহই নেই আমার। জাহান্নামে যাক না।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছে, একটু বুদ্ধি রাখবি তো। খোঁজ নিয়ে জানা যেত, আগেরটা না জানিয়ে আবার বিয়ে করেছে কি না। ডিভোর্স নিতে হলে কাজে লাগত।

কল্যাণীর তখনই মনে হয়েছে, ভুল হয়ে গেছে। জানলে তো দোষ ছিল না।

কিন্তু এখন প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতেই পারছে না। এখন নিজে বাঁচতে চায়। রিমিকে বাঁচাতে চায়। সে জন্যেই অফিসে বসে বসেও দুশ্চিন্তা, রিমি বাড়ি ফিরল কি না।

টেলিফোনটা সেদিন আসার পরই রিমিকে সাবধান করে দিয়েছে। রাস্তায় ঘাটে কোন লোক যেচে কথা বললেও উত্তর দিবি না। কেউ যদি এসে বাবা বলে পরিচয় দেয় ...

রিমি হেসে উঠে বলেছে, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত হয়েছে কল্যাণী। মনে মনে বলেছে, রিমি তেমন মেয়েই নয়।

—কল্যাণীদি, আপনার ফোন।

আবার কে একজন ডেকে দিল। যাবে কি যাবে না এক মুহূর্ত ভেবে

নিল কল্যাণী, ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে, তবু না গিয়েও উপায় নেই। কি ভাববে সকলে।

ফোনটা ধরতে যাচ্ছিল, ও প্রান্তে বসা দুটি মেয়ের একজন বলে উঠল, বাবা, এত ফোন তো আমাদের কারও আসে না।

কথাটা গিলে ফেলার জন্যে মুখে হাসি আনতে হল।

—কে বলছেন ?

গলার স্বর একটু কঠিন করল।

উত্তর এল, আমি পরিতোষ বলছি, একবার যাব আপনার অফিসে, একটা কথা ছিল।

বিব্রত বোধ করল কল্যাণী।

বলে উঠল, অফিসে ? না, না, না। কি দরকার ?

পরিতোষ বললে, গিয়েই বলব।

উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করল কল্যাণী। বলে কি ! এই অফিসে এসে দেখা করবে ? সুবিমলের কথা বলবে হয়তো কিছু, আর অফিসসুদ্ধ লোক শুনবে। তারপর আর এ অফিসে কাজ করতে পারবে নাকি ও ! সেদিন বাসের মধ্যেই এমনভাবে জোরে জোরে বলছিল, বাসসুদ্ধ লোক তাকাচ্ছিল ওর দিকে।

কল্যাণী বলে উঠল, না না, অফিসে নয়।

—তবে ? বাড়িতে যাব ?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কল্যাণী বললে, হ্যাঁ তাই। কিন্তু কেন ?

—গিয়ে বলব, গিয়ে বলব।

কল্যাণী কী যেন ভাবল। বাসন্তীর মা কখন আসে। রিমি কখন ফেরে স্কুল থেকে।

বললে, বুধবার বিকেলে, চারটের আগে। তার পরে আসবেন না।

কারণ মা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কাজের মেয়েটা আসে। রিমি ফিরে আসে।

কি একটা অজুহাত দিয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসেছিল।

বেশ বুঝতে পারছিল, সুবিমলই ওকে পাঠাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই রাজি হতে হল। অন্তত অফিসের কেউ তো জানতে পারবে না। আর ছোটমামার কথা মতো সুবিমলের খবরাখবরও নিতে পারবে।

এসেছিল পরিতোষ। কনকনলিনী আগেই শুনেছিলেন কল্যাণীর কাছে, বললেন, যা না, শুনেই আয় কী বলতে চায়।

দরজার পরদা ফেলাই ছিল, যাতে ঠিকে কাজের মেয়ে বাসন্তীর মা

এলে দেখতে না পায়।

পরিতোষের সঙ্গে কথা বলছিল, সুবিমল কী বলেছে, একবার মেয়েকে দেখতে চায়, ওরও তো একটা কর্তব্য আছে মেয়ের প্রতি ...

ঠিক সেই সময়েই রিমি ফিরে এল, পরদা সরিয়ে উঁকি দিল, আর যেহেতু রিমিকে আড়ালে রাখতে চাইছিল, কিংবা সুবিমল সম্পর্কে কথা হচ্ছিল বলেই ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে গেল কল্যাণী।

কোনওক্রমে পরিতোষকে বিদায় দিয়ে যেন বাঁচে। বিদায় দেবার সময় বললে, শান্তিতে থাকতে দিন আমাকে, অশান্তি চাই না।

বাবা মারা গেল। ছোটমামা বললে, আর নয়, এখনও অক্ষয়বাবু আছেন, এরপর উকিলের জন্যে ছুটে বেড়াতে হবে।

কল্যাণীও সায় দিল, তবে তাই।

বিপক্ষের উকিল অক্ষয়বাবুকে বললে, মিউচুয়াল করে নিন, স্ক্যান্ডাল বাড়িয়ে আর কি হবে।

ডিভোর্স হয়ে গেল।

বাড়তি চাপ দেওয়ার জন্য অক্ষয়বাবু অ্যালিমনির অঙ্কটা এমনই বড়সড় করেছিলেন, যা দেখে সুবিমল ভয় পেয়ে যাবে।

কল্যাণী অবশ্য বলেছিল, ওর টাকা আমার ছুঁতেও ঘেন্না, নিজেও ছোঁব না, রিমিকেও ছুঁতে দেব না।

অক্ষয়কাকা হেসে বললেন, সে তো পরের কথা, এখন ওকে একটু ভড়কে দেবার জন্যে এসব করা দরকার। তুমি অমত কোরো না, সই করে দাও।

সই করে দিয়েছিল কল্যাণী। ভেবে রেখেছিল, যদি দিতে আসে... মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে। বলেছিল, অমন একটা লোকের টাকা নিলে রিমির অমঙ্গল হবে।

দু'পক্ষের উকিল মিলে একটা মিউচুয়েল সেটেলমেন্টে এল।

টাকা তো নিতেই চায়নি কল্যাণী, অক্ষয়বাবু অ্যালিমনির দাবি ছেড়ে দিতেই ডিভোর্সটা সহজ হয়ে গেল। রিমিকে নিয়ে যেটুকু ভয় ছিল, শর্ত হিসেবে সে দাবি তুলতেই পারল না সুবিমল।

মনের মধ্যে যেটুকু আতঙ্ক ছিল তাও দূর হয়ে গেল। রিমি এখন আমার, আমার। কল্যাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যে চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাও করতে পারবে না।

পুরুষদের হাতে ওই একটাই অস্ত্র। চরিত্র খারাপ বলেই তাড়িয়ে দিয়েছি। কিংবা চরিত্র খারাপ বলেই ছেড়ে চলে গেছে। এক দলা কাদা ছুঁড়ে দাও, কিছুটা লেগে থাকবেই। মেয়েরাই বলবে, সন্দেহ করবে।

কিন্তু তার পর থেকে রিমিকেই ভয় পেতে শুরু করেছিল কল্যাণী।

'একবারটি শুধু দেখতে চাই।'

ওই কথাটা শোনার পর ওর মনে হয়েছে এর মধ্যে সুবিমলের নিশ্চয় কোনও ছল-চাতুরি আছে। কল্যাণীকে নিঃস্ব করার চেষ্টা। যে কোনও উপায়ে রিমির ভালবাসা আদায় করতে পারলেই ওই লোকটা আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। আইনের পথে যা পারবে না, কপট অভিনয় দিয়ে তা করতে চায়। কল্যাণীকে নিঃস্ব করে দিতে চায়।

ভয় শুধু সুবিমলকে নয়, ভয় নিজেকেও। কারণ, এখন আর তার ওপর কোনও রাগ বা বিদ্বেষ নেই। স্মৃতিই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তবু, এক একসময় রিমিকে একটা পরম সম্পদ বলে মনে হয়। ও বিশ্বাস করে না, যে বাপ তার মেয়েকে দেখার জন্যে এত বছর কোনও আগ্রহ দেখায়নি, খোঁজ নেয়নি সে কেমন আছে, আজ হঠাৎ তার আগ্রহ হবে কেন। এটা নিশ্চয় ওর কোনও চাল।

অবশ্য এক একসময় মনে হয়, হতেও তো পারে। হয়তো অনুশোচনা। যৌবনের সেই উত্তেজনা হারিয়ে গেলে কোনও কোনও মানুষ তো অনুতাপে দগ্ধ হয়। কেউ কেউ সাধুসন্ন্যাসীও হয়ে যায়।

বড় লোভ হয়, রিমির জন্যে অন্তত সুবিমল তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ুক। তা হলে ক্ষমা করে দেবে ও। তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি আছে।

লোকচক্ষে এই যে এতকাল হেয় হয়ে থাকা, তারা দেখুক, সেই মানুষটা তার কাছেই আজ কৃপাপ্রার্থী। শান্তি খুঁজতে তার কাছেই আসতে চায়।

সে জন্যেই বড় ভয় ওর নিজেকে।

পরিতোষ দেখা করতে এসে বলেছিল, সে এখন অন্য মানুষ ; মাঝে মাঝেই দুঃখ করে। ভুল স্বীকার করে।

পরিতোষ বলেছিল, আসলে রিমিকে দেখতে চায় বলেছে, কিন্তু শুধুই কি রিমিকে !

শুনে মুহূর্তের জন্যে ওর বুকের ভেতরটা কেমন নরম হয়ে গিয়েছিল।

আর তখনই পরদা সরিয়ে উঁকি দিল রিমি।

অপ্রতিভ ভাব কাটিয়ে নিমেষের মধ্যে কঠিন হয়ে গিয়েছিল কল্যাণী।

বলে উঠেছিল, আপনি এখন যান, এখন যান।

উঠে পড়েছিল।

আর পরিতোষকে বিদায় জানাবার সময় বলেছিল, আমি আর কোনও অশান্তি চাই না। আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।

রিমি এখন কলেজে পড়ে, বেশ বড় হয়ে গেছে।

মা মেয়ে এখন অনেক কথাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এখন তো আর কোনও ভয় নেই। দুদিন বাদেই রিমির বিয়ে দিতে হবে। ব্যস, তারপর কল্যাণী নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত এবং একা। কনকনলিনী আর ক'দিনই বা বাঁচবেন!

কল্যাণী হঠাৎ বলে ফেলল, আচ্ছা রিমি, তোর বাবা যদি হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়!

রিমি ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল, 'বাবা' 'বাবা' বল কেন তুমি। যদি আসেও কোনওদিন, আমার কাছে সে শুধুই একটা লোক। একটা অচেনা লোক।

একটু থেমে বললে, একটা খারাপ লোক।

কল্যাণী কোনও কথা বলল না, চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণী বললে, ঠিকই বলেছিস, একটা লোক।

আরও কিছুক্ষণ পরে বললে, আমার কাছেও।

পাঁচ

নিউ মার্কেটের ভেতরে এই ছোট্ট রেস্তোরাঁটা বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে লোভনীয় এর নির্জনতা। প্রায় সময়ে কোনও খদ্দেরই থাকে না। শীতের দুপুরে এর চেয়ে উপাদেয় আর কি থাকতে পারে।

এই রেস্তোরাঁর খবর সুবিমল জানতই না। রঞ্জনাই ওকে নিয়ে এল।

বলেছিল, চলো কোথাও একটু বসে কফি খাওয়া যাক।

—চলো। মুখে বলল সুবিমল, কিন্তু ঠিক কোথায় যাওয়া যায় ভাবছিল। রাস্তার ওপারে কয়েকটা রেস্তোরাঁ আছে, কিন্তু সেগুলোয় সব সময়েই ভিড় উপচে পড়ছে।

অফিস থেকে একদিন পরিতোষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কেনাকাটা সেরে বললে, চল পরিতোষ, একটু চা খেয়ে নিই।

তারপর যেখানেই যায়, ভিড় ভিড়, একটাও চেয়ার খালি নেই। শেষ অবধি কি আর করে, দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করল। চেয়ার দখল করতে হলে তক্কে তক্কে থাকতে হবে, যেই দু'জন বিল মিটিয়ে উঠবে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবিমলের মুখের ভাব দেখলে তখন মনে হত বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন।

এতকাল পরে হঠাৎ রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, গঙ্গার ধারে নয়, বোটানিকসে নয়। লেকের পাড়ে নয়। নিউ মার্কেটের জনস্রোতের মধ্যে। স্থির হয়ে দাঁড়াবারও উপায় নেই, কাউকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে, কখনও রঞ্জনার কথার জবাব দেবার জন্যে কাছে আসতে হচ্ছে।

অথচ জানে, ওপারে গিয়ে কোথাও কফি খাওয়ার জায়গাও পাবে না। ভিতরে ভিতরে যা, তার চেয়েও বেশি চাইছিল নির্জনতা। যা পাওয়ার উপায়ও নেই।

রঞ্জনাই সুরাহা করে দিল। বললে, এদিকে এদিকে।

বলে পা বাড়াল মার্কেটের ভিতরের দিকে।

মার্কেটের ভিতরে এমন যে একটা সুন্দর চা-কফি খাওয়ার জায়গা আছে জানতই না।

একটু আগে ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাইরের বাতাস, সে জন্যেই মার্কেটের ভিতরটা বেশ সুস্বাদ। রেস্তোরাঁর ভিতরটায় রীতিমতো উষ্ণ আমেজ। তা না হলে মার্কেটে ঢোকাই দায়। ঘামতে ঘামতে কি করে যে লোকে জিনিসপত্তর কেনে।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে সুবিমল অভিভূতভাবে বললে, বাঃ, কি করে আবিষ্কার করলে এমন একটা সুন্দর জায়গা ?

দু'চোখে উজ্জ্বল হাসি ছিটিয়ে সুবিমলের চোখের দিকে তাকাল।—আবিষ্কার ? পেনিসিলিন না কলম্বাসের আমেরিকা ?

হাসতে হাসতে বললে, এ তো সবাই জানে।

যেভাবে পথ চিনে চিনে এল এখানে, যেভাবে ঢুকল এবং চেয়ার টেনে নিয়ে বসল অতি অবহেলায়, সুবিমলের মনে হল হয়তো প্রায়ই আসে। কার সঙ্গে আসে ? ঈষৎ সন্দেহের দোলা দিয়ে গেল মনের মধ্যে। আসুক না, যার সঙ্গে খুশি আসুক। আমি তো আর নতুন করে প্রেমে পড়তে যাচ্ছি না। কলেজের দিনগুলো চুকেবুকে গেছে, একটা ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা মুছে না গেলেও ক্ষতি নেই, মুছে গেলেই বা ক্ষতি কি।

কিন্তু এই যে হঠাৎ দেখা হওয়া, এই আকস্মিকতাই যেন আবার একটা উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। একটা রোমাঞ্চ।

মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল সুবিমলের, যা খুঁজছিল সেই নির্জনতা পেয়ে। এক কোণে এক জোড়া অল্প বয়েসী কিশোর-কিশোরী অনর্গল কথার মধ্যে ডুবে গেছে। ওদের দিকে তারা ফিরেও তাকাল না।

রঞ্জনা প্লাস্টিকের প্যাকেট পাশে রেখে বাঁ হাতের দুটো আঙুল দেখাল দূরে দাঁড়ানো বয়কে।—কফি। হট।

সুবিমল রেস্তোরাঁর চারপাশে চোখে বুলিয়ে বললে, দারুণ। চার্মিং।

রঞ্জনা স্মিতহাস হয়ে বললে, মোটেই না। আমি সঙ্গে আছি বলে তোমার এত সুন্দর লাগছে। চার্মড হবার মতো কেউ কাছে থাকলে, তবেই না চার্মিং !

একটা মৃদু সুগন্ধ অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছিল সুবিমল, রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় থেকেই। কিন্তু এত বিমুগ্ধ হয়ে ছিল এতক্ষণ যে, খেয়ালই হয়নি ওটা কোনও সেন্টের গন্ধ, রঞ্জনা ব্যবহার করেছে।

বললে, তোমার সেন্টের গন্ধটা খুব মিষ্টি।

—আরে ধুস, ওটা তো আমার গায়ের গন্ধ।

দু'জনেই হেসে উঠল।

এ মেয়েকে যতই ভাল লাগুক, যতই প্রেমে পড়ে যাও, কিছুতেই তা

বোঝাতে পারবে না। মুখ ফুটে বলতে পারবে না। কারণ সেটা একেবারেই বেমানান ঠেকবে।

এগোতে সাহসও হয় না, যেমন কলেজ-জীবনে ওরা তিন বন্ধু—নীলাদ্রি, অরুণ আর সুবিমল এক পা এগিয়েছে তো দু পা পিছিয়ে এসেছে। কখন কার কাছে একজনের ক্ষণিক দুর্বলতার কথা ফাঁস করে দেবে তার ঠিক নেই।

একদিন হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, সেদিন নীলাদ্রি না ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেতে গেলাম, খুব বৃষ্টি তোরা আসিসনি...

নীলাদ্রির দিকে ফিরে চোখে রহস্য নিয়ে বললে, কী রে রেগে যাবি না তো ?

নীলাদ্রি হেসে ফেলে বললে, স্বচ্ছন্দে। ওদেরটাও বলতে হবে কিন্তু।

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললে, দুজনে ফুচকা-টুচকা তো খেলাম, তারপর নীলাদ্রি কেবল বলছে, প্ল্যানেটেরিয়াম তো দেখিনি কোনওদিন, চল না দেখে আসি।

আমি বললাম, ওই তো চোখের সামনেই, দেখ না যত খুশি।

—ও কী বললো জানিস ? 'না না, ভেতরে, ভেতরে গিয়ে।'

বলেই শব্দ করে হেসে উঠেছিল রঞ্জনা। ওরা দুজন তো বটেই, প্রথমে মুখ কাচুমাচু করে থেকে, শেষে নীলাদ্রিও।

সেই রঞ্জনাকে মুখ ফুটে বলা যায় নাকি, বলা যায় যে তোমার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কুরকুর করছে।

তাই সুবিমল অন্য পথে গেল। বললে, একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেছ সত্যি, কিন্তু কাকে নিয়ে আসো এখানে !

—আরে ধুর, কত লোককে তো নিয়ে এসেছি, অফিসের কয়েকজনকেও। কিন্তু কেউ পোষ মানে না, ফুরুত ফুরুত করে উড়ে পালায়।

সুবিমল বললে, সেটা তোমার দোষ, তুমি সব সময়ে নিজেকে রহস্যময়ী করে রাখবে, কার এত বুকের পাটা যে বলে ফেলবে 'আই লাভ ইউ'।

অবাক হওয়ার ভান করে সুবিমলের চোখে চোখ রেখে তাকাল রঞ্জনা।

বললে, প্রেমে পড়তে বুকের পাটা লাগে নাকি ? ভাল লাগবে, তারপর স্রেফ প্রেমে পড়ে যাবে, দ্যাটস অল। অত ভাবনাচিন্তা করে, সাহস সঞ্চয় করে কি প্রেম হয় নাকি।

হাসতে হাসতে বললে, আসলে ব্যাপার কী জান, আজকাল কেউ প্রেমে পড়ে না। সবাই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে, যে-বাসে খালি সিট পায় সেটাতেই উঠে পড়ে।

সুবিমল হেসে ফেলেছিল ওর কথায়।

আর রঞ্জনা চটপট ওর ব্যাগ থেকে একটা চটি আকারের ডায়েরি কিংবা টেলিফোন-নম্বর লেখার বই বের করে বললে, তোমার অফিসের ঠিকানা বলো, ফোন নম্বর।

সুবিমল ভাবল, যাক বাবা, বাড়ির ঠিকানা চায়নি। কোনওদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে কী বলবে কল্যাণীকে। কলেজে আমাদের এক বন্ধু ছিল, রঞ্জনা। আমার, নীলাদ্রির, অরুণের বন্ধু। এ কথা বলা সহজ ছিল বলেই হাসির ছলে কিছু কিছু পুরনো দিনের কথা বলেছে।

বিয়ের পরে পরেই, একদিন ওরা তিন বন্ধু বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, তখনও যোগাযোগ রাখত ওরা, এখন সব দূরে দূরে, মুড়ি তেলেভাজার আড্ডা, কল্যাণীও এসে বসেছে, রঞ্জনার কথা উঠল, কে তুলেছিল মনে নেই, তিনজনই বলেছিল, মেয়েটা খুব লাইভলি ছিল কিন্তু।

কি বলত সে, কি না বলত তার দু-চারটে নমুনাও পেশ করেছিল।

শুনতে শুনতে কল্যাণীও হাসছিল। হাসতে হাসতে বললে, কি আশ্চর্য, আপনারা তিন-তিনটে বীরপুরুষ, একজনও গেঁথে তুলতে পারলেন না!

সুবিমল হেসে বললে, আমার কথা অন্য, ওদের বলো। ঈশ্বর তোমাকে আমার জন্য ঠিক করে রেখেছিল, তা না হলে কে পার করত তোমাকে।

কল্যাণী হেসে বলেছে, পাত্তা পাওনি সে-কথাই বল। ও যা মেয়ে, শুনে যা বুঝছি, তোমাকে পাত্তা দিত না।

নীলাদ্রি বললে, সত্যি কথা বলব? আমাদের মধ্যে ওকেই বরং একটু পাত্তা দিত।

সুবিমল বললে, উঁহু, অরুণকে। কি একটা বই চাইতে ওর বাড়ি চলে গিয়েছিল মনে নেই?

কল্যাণী বলে উঠেছিল, বাপ রে, কি জেলাসি, আজও মনে রেখেছে!

অরুণ বলেছে, আসলে নীলাদ্রিকে একটু প্রশ্রয় দিত। ব্যাটার সাহসই হল না। কই বাবা, আমাদের তো কোনওদিন ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেতে একা-একা নিয়ে যায়নি।

ওরা চারজনই হেসে উঠেছিল অরুণের কথায়। এর সবই ছিল

মুড়ি-তেলেভাজা খাওয়া আড্ডার নির্দোষ হাস্যপরিহাস। নিরাবয়ব একটি মেয়ে, যার নাম রঞ্জনা।

তার সঙ্গে নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে-যাওয়া রঞ্জনার অনেক তফাত।

আজ কি বাড়ি ফিরে বলা যাবে নাকি, যে নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রঞ্জনার সঙ্গে। বললেই বিপত্তি।

সেদিনের আড্ডা রঞ্জনা প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে মোড় নেবার আগে কল্যাণী বলেছিল, ইস্, মেয়েটাকে এত দেখতে ইচ্ছে করছে।

তারপর হেসে বলেছে, আপনারা সবাই অপদার্থ।

মুশকিল এই, আজ এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর ছবিটা একেবারে বদলে গেছে।

অনেক বছর বাদে দেখা হল বলেই কি রঞ্জনা ওকে আগের মতো 'তুই' না বলে 'তুমি' বলে ফেলল। কই, আর তো একবারও 'তুই' বলল না। হয়তো ভুলেই গেছে। এমন তো প্রায়ই হয়। কলেজের বন্ধুদের কোনও একজনকে হয়তো 'তুমি' বলত, অনেক বছর বাদে সমস্যায় পড়তে হয়, স্রেফ 'আপনি' হয়ে যায় সে। আবার যাকে 'আপনি' বলত, পরে দেখা হলে এতই চেনা লাগে যে 'তুমি' বলে ফেলে।

কিন্তু রঞ্জনার তো সবই মনে আছে, তা হলে ? হয়তো বয়েস। কলেজ ছাড়ার পর পাঁচটা বছরে কত পরিণত হয়ে যায় মানুষ, পনেরোটা বছর এগিয়ে যায়। অনেকের তখন আর সেই ছেলেমানুষি স্বভাব থাকে না।

সুবিমলের মনে হল ওর নিজের চেহারাই হয়তো তার জন্য দায়ী। বেশ খানিকটা মোটা হয়েছে, চুল কাটার সেলুনে গিয়ে চুল নিয়ে আর তেমন কায়দা করতে ইচ্ছে হয় না, সব চেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে বোধ করি চাকরি আর সংসার। সংসার মানে শুধুই কল্যাণী আর মা, ছোট বোন। বাবা মারা গিয়ে এখন সব দায়িত্ব ওর ঘাড়ে।

তখন ওর চেহারায় একটা স্টুডেন্ট ছাপ ছিল, এখন নগণ্য উচ্চ কেরানি।

এই চেহারাই ওকে 'তুমি' বলিয়েছে। ইচ্ছাকৃত নয়। এ নিয়ে স্বপ্ন গড়ে তোলা অর্থহীন। তবু বুঝতে পারছে ওর বুকের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ খেলা করছে।

লোভ কি ? শুধুই লোভ !

খুব সাবধানতার সঙ্গে কথা বলছিল সুবিমল, মুখ ফসকে না 'তুই' বেরিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য মনে হল রঞ্জনা যদি আরও মোটা হয়ে যেত, দেখতে এত সুন্দর লাগত না, প্রায় অপরিচিত ঠেকত, আর তখন সুবিমল হয়তো 'আপনি' বলে বসত ।

ওর সেই ক্ষুদে নোটবুক-এ অফিসের নাম ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে নিল রঞ্জনা ।

—আর তোমারটা ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাগজ খুঁজল সুবিমল, পেল না । দূরে এককোণে একজোড়া কিশোর-কিশোরী গল্প করছে ! হাসছে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে । দেখল মেয়েটির সামনে বই খাতা ।

হেসে বললে, একটা কাগজ চেয়ে আনব ?

—এই না । ওরা প্রেমে মশগুল হয়ে আছে, ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো না ।

অপ্রতিভভাবে সুবিমল বললে, তা হলে কোথায় লিখে নেব ?

রঞ্জনার সুডোল সুন্দর হাতখানা, হাতের তর্জনী এগিয়ে এল ওর দিকে । ওর বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে বললে, এইখানে । বুকের মধ্যে টুকে নাও ।

আঙুলটা এসে বুকের যেখানটায় ছুঁয়েছিল, সারা রাস্তা সে জায়গাটা কেমন সিরসির করছিল । যেন এখনও ছুঁয়ে আছে । অথচ কলেজ জীবনে কত ধাক্কাধাক্কি কত ছোঁয়াছুঁয়ি, অথচ সেগুলো তেমন রোমাঞ্চ দেয়নি । কারণ তার অংশীদার ছিল নীলাদ্রি আর অরুণও । এই স্পর্শ কিন্তু সুবিমলের একার । একার এবং নিজস্ব ।

পরিতোষ অফিসের বন্ধু । বুকের ভেতরটা গুনগুন করছিল । গতকালের ঘটনা ওর সারা শরীরে ময়ূরপেখম বুলিয়ে দিয়ে গেছে । অনেকখানি স্বপ্ন আর আশা । পরিতোষকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু এ সব কথা গোপন রাখার মধ্যেই যেন আরও আনন্দ ।

শুধু একটা অপরাধবোধ ফাঁকে ফাঁকে কাঁটার মতো বিঁধছিল বুকে । রঞ্জনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ও বিশ্বভুবন ভুলে গিয়েছিল । কি অন্যায়, কি অন্যায় । মনেই পড়েনি কল্যাণীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে চেক আপ করানোর জন্য ওর যাওয়ার কথা ছিল ।

কল্যাণীও তো ওর সারা গায়ে রং মাখিয়ে দিয়েছিল একদিন । রামধনুর রং । ভরিয়ে দিয়েছিল ওর সকল শূন্যতা । কলেজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর রঞ্জনা হারিয়ে গিয়েছিল । ওর ধারণা, প্রেম ছিল না, ভালবাসা ছিল না । কিন্তু কি একটা অদ্ভুত টান ছিল, দুর্বোধ্য

একটা নেশা । যত দূরে সরে এসেছে, ততই কাছে যাবার জন্য ছটফট করেছে মনে মনে । অথচ উপায় নেই ।

চতুর্দিকে ছিটকে যাবার আগে ছোট্ট একটা গেট টুগেদার করেছিল ওরা ।

একটা মেয়েদের হস্টেলে থাকত রঞ্জনা । বাবা আর দাদা জামশেদপুরে । মা নেই । এইটুকুই জানত ।

—কোথায় যাবি এখন, ঠিকানাটা দে । সুবিমল বলেছিল ।

রঞ্জনা হেসে উঠে বললে, দু-দুটো বছর সময় দিলাম, সেই যেখানে ছিলি সেখানেই রয়ে গেলি । এখন আর ঠিকানা নিয়ে কি হবে ।

নীলাদ্রি বলেছিল, তবু দে না ঠিকানাটা, দুম্ করে একদিন চলে যাব জামশেদপুর ।

অরুণ বলেছিল, চিঠি তো লিখতে পারব ।

সুবিমল আর কিছু বলেনি, রঞ্জনাও ঠিকানা দেয়নি । ডেড লেটার অফিসের চিঠির মতো সুবিমল তারপর বেঠিকানা ঘুরেই বেড়িয়েছে । শেষে পৌঁছে গেছে কল্যাণীর কাছে । ভালবাসা, প্রেম না কর্তব্য, কিছুই জানে না । শুধু মনে হয়েছে একটা জ্বালা-জুড়োনো প্রলেপের মতো ।

সেই কল্যাণীর গর্ভে ওর সন্তান, তিলে তিলে বড় হচ্ছে । তার মধ্যেও একটা অদ্ভুত মোহ আছে । একটা শিশু আর কয়েক মাস পরেই ওকে 'বাবা' বলবে । বাবা, বাবা । একটা রোমাঞ্চময় পরিচয় ।

অথচ কল্যাণীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ও বেবাক ভুলে গেল । এক সপ্তাহ আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল । সকালে অফিসে বেরোনোর সময় কল্যাণী মনে পড়িয়েও দিয়েছিল ।

অফিসে বসে সে-কথা ভাবতে ভাবতে একদিকে অনুশোচনা হচ্ছিল, আবার এক সময় নিজের ওপরই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ভাবলে, জীবনটা কি শুধু কর্তব্য নাকি ? এই পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধও তো আমার প্রাপ্য ।

কল্যাণীকে ডাক্তার দেখিয়ে আনার পর অপরাধবোধ চলে গিয়েছিল । প্রতিদিনই ইচ্ছে হত রঞ্জনার অফিসে একবার টেলিফোন করার । অফিসের নামটাই মনে আছে, ডিপার্টমেন্ট ভুলে গেছে । টেলিফোন নম্বর তখনই ভুলেছিল ।

রঞ্জনা কি ওকে পরীক্ষা করতে চায়, মনে রেখেছে কি না । তা না হলে ওর ওই ছোট্ট নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে দিতে পারত ।

সে-কথা বলার সুযোগও পায়নি সুবিমল । তার আগেই ও বলে ফেলেছে, কতগুলো ফোন নম্বর লেখা আছে ওখানে ?

—অনেক । একটা লালবাজার ।

আঁতকে ওঠার ভান করেছে সুবিমল ।—পুলিশ ! বাপ রে ।

ভেবেছিল, অফিসের নাম যখন মনে আছে, খুঁজে বের করা অসুবিধে হবে না । অপারেটর যদি বলতে নাও পারে, একদিন সটান চলে যাবে ।

যেতে হল না ।

সুবিমল মাথা নিচু করে একটা ফাইলের ওপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল । নোট দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠাতে হবে ।

ঠক ঠক ঠক ।

টেবিলের ওপর কেউ কাচের গ্লাসটা দিয়ে তিনবার ঠক ঠক ঠক করল ।

চমকে চোখ তুলল সুবিমল । চোখ তুলতেই আরও বড় চমক ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সুবিমল ।—আরে তুমি !

অবাক হয়েছিল বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল । যেন বড়সাহেব ওব টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ।

এত সমীহ করে উঠে দাঁড়ানোর কথা নয় বুঝতে পেরেই বসে পড়ল । বললে, বসো বসো ।

তবু বসল না রঞ্জনা । মুখেচোখে কেমন কপট ক্রোধ ।

এই শরীরটা চিরকাল সুবিমলকে লোভ দেখিয়ে এসেছে । ও চেয়ারে বসে পড়েছে, আর রঞ্জনার দীর্ঘ শরীর ও প্রান্তে । চোখের দৃষ্টি টেবিলের সমতল থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে রঞ্জনার মুখে এবং শেষে চোখে চোখ রাখার আগেই রঞ্জনার লোভনীয় শরীরটাকে চেখে নিল । ওর বুকের ভেতর থেকে যেন দুখানা অদৃশ্য হাত বেরিয়ে এসে রঞ্জনার সমস্ত লুব্ধতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইল । মেদমাংসের দেহ নয়, এক-একজন নারীর ত্বকের মধ্যে এমন জাদু থাকে যে হাত বুলিয়ে স্বাদ নিতে ইচ্ছে করে ।

মাথার ভিতর কেমন ঝিমঝিম করে উঠল, কোনও ক্রমে বললে, বসো বসো ।

রঞ্জনা বোধহয় বুঝতেও পারেনি এই নিমেষের চোখ বোলানোয় কী ঘটে গেছে সুবিমলের মস্তিষ্কে ।

তেমনই কপট ক্রোধের মুখে রঞ্জনা বললে, এর নাম নাকি প্রেম !

অর্থাৎ সুবিমল তারপর আর যোগাযোগ করেনি কেন । একটা ফোনও তো করতে পারত ।

সুবিমল এতক্ষণে হাসতে পারল । পরমুহূর্তেই আশপাশে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ ওদের লক্ষ করছে কি না, অথবা কথাটা শুনেছে কি

না ।

এ-কারণেই রঞ্জনাকে রহস্য মনে হয় ।

যে-কথাটা চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে সারা শরীরে, বুকের গভীরে তোলপাড় ঘটে যাবার কথা, সেটাই ও এত অকপটে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, কে শুনছে না শুনছে পরোয়া না ক'রে, যে উক্তিটাকে কপট মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না ।

সুবিমল মৃদু হাসল ওর কথায় । বললে, বসো বসো ।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রঞ্জনা, তারপুর বললে, চটপট কাজ সেরে নিয়ে কেটে পড়ো ।

রাস্তায় বেরিয়ে বললে, চলো তোমায় আজ ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খাওয়াব । বেচারি নীলাদ্রির ওপর তা হলে আর জেলাসি থাকবে না ।

সুবিমল ক্রমশই সাহসী হতে চাইছিল । বলে বসল, ধুস, ফুচকা ? অন্য কিছু খেতে চাই ।

—কী ? চুমু ? বলেই হো হো করে হেসে উঠল রঞ্জনা ।

ঝট করে হাসি থামিয়ে, এই, নীলাদ্রির খবর কিছু জানো ? কোথায় আছে ? অরুণ ?

—নীলাদ্রি রাঁচিতে । চিরতা খাওয়া মুখ করে অরুণের খবরও বলল ।

এ জন্যই রঞ্জনাকে চিরকাল রহস্যময়ী মনে হয়েছে । একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে এসে নিজেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় । কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে বোঝার উপায় থাকে না ।

অনেক আশা নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি ফুচকা-টুচকা খেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাঁচিলে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল রঞ্জনা । তারপর প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে একটা কম ভিড়ের বাস পেয়ে ঝট করে উঠে পড়ে হাত নেড়ে দিল ।

ব্যস, পৃথিবী ব্ল্যাঙ্ক । সুবিমল একা একা একা । ও অনুভব করতে পারছিল যে, রঞ্জনা ওকে গ্রাস করে ফেলছে । ওর সারা দেহ-মন-প্রাণ । এ এক অদ্ভুত নেশা যেন ।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুবিমলের মনে হল, কল্যাণী যেন হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে । ওর বুকের মধ্যে কল্যাণীর জন্য একটুও জায়গা নেই । যা আছে, যেটুকু আছে, তা শুধুই কর্তব্য । তার অতিরিক্ত কিছুই নেই ।

পরের দিন ও যা আশঙ্কা করেছিল তাই ।

অফিসসুদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে রঞ্জনার সঙ্গে ও বেরিয়ে গিয়েছিল,

অফিস ছুটির বেশ কিছুটা আগেই । সকলেই লক্ষ করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেনি মেয়েটি কে । লক্ষ না করে উপায়ও ছিল না, কারণ রঞ্জনার চেহারায় হাবেভাবে এমন একটা চটক আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না ।

অফিসে আসতেই পরিতোষ ওর টেবিলে উঠে এল ।—কি ব্রাদার, সিঙ্কিং সিঙ্কিং মনে হচ্ছে । বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দেব নাকি ।

সুবিমল হাসল । ও যদিও কল্যাণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তবু পরিতোষের মতো বন্ধু বিশ্বাসঘাতক হতে পারবে না ।

কিন্তু কল্যাণী কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে ।

কিছুটা অপরাধবোধ থেকেই বোধহয় ও বাড়ি ফিরে কল্যাণীর সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায়নি । যেন ওর মুখ দেখলেই কল্যাণী ওর ভিতর অবধি পড়ে ফেলবে । চোখোচোখি হতে ভয় বলেই এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে ।

পরিতোষ ভুরু কাঁপিয়ে প্রশ্ন করল, মেয়েটি কে ?

—কে আবার । এত সন্দেহই বা কেন তোমার ।

পরিতোষ বললে, দ্যাখো গুরু, বলে বসো না ও তোমার মাসতুতো বোন । যখন চলে গেলে, মনে হচ্ছিল যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছ ।

সুবিমল বললে, ও সব কিছুই নয় । কলেজে একসঙ্গে পড়তাম । হঠাৎ দেখা হল সেদিন, তারপর...

—তোমার যে একটা জলজ্যান্ত বউ আছে সে-কথা জানে ?

সুবিমল হেসে বললে, হ্যাঁ । কিন্তু ভিতরে ভিতরে চুপসে গেল ।

মনে মনে ভাবলে, এরা কি আমাকে একটা স্কাউন্ড্রেল মনে করে !

প্রথম দিন নিউ মার্কেটে দেখা হওয়ার সময় ও এমন একটা রোমাঞ্চময় জগতে চলে গিয়েছিল যে 'বিয়ে করে ফেলেছি' বলে ফেলে স্বপ্নময় সময়টুকুকে বিস্বাদ করে তুলতে চায়নি । কিন্তু তারপরই ওর মনে হয়েছে, কথাটা বলে ফেলা উচিত ছিল । কারণ ওর মনে হয়েছিল, রঞ্জনার মনে সত্যি সত্যি ওর সম্পর্কে একটা দুর্বলতা আছে । ও নিজেই শুধু এতকাল বুঝতে পারেনি ।

তাই ভিক্টোরিয়ায় যেদিন এল, হালকা পায়ে দুজনে হেঁটে চলেছে, স্বপ্নের ডিঙি নৌকোয় যেন এক-একটা ঢেউ পার হচ্ছে, গাড়ি ভিড় হর্ন, লোক লোক লোক, রঞ্জনা বললে, কলকাতা শহরটা জঘন্য জঘন্য, নিরিবিলি কেউ বসবে, প্রেমে ডুবে থাকবে, তাই না সুবিমল, দুটি হৃদয় এক হওয়ার কোনও জায়গা নেই ।

সুবিমল স্মার্ট হবার চেষ্টা করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল । বললে, এমনিতেই তো আমার আর এক উপদ্রব, শ্বশুরবাড়ির কেউ না দেখে

ফেলে । বউ নিজে দেখলে তো কুরুক্ষেত্র ।

—বিয়ে করেছ ? মৃদু হাসি দেখা দিল রঞ্জনার মুখে ।

সন্ধে হয়ে এসেছে, আলো জ্বলেছে । একটা অস্পষ্ট আলো-আঁধারে চারপাশ সুন্দর হয়ে উঠেছে সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে গিয়ে । ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শুভ্রতা আর রঙিন আলোর ঝরনায় পৃথিবী হঠাৎ যেন অপরূপ হয়ে উঠল ।

—বিয়ে করেছ ? মৃদু হাসল রঞ্জনা ।

পরমুহূর্তেই বলে উঠল, গ্র্যান্ড । জমবে তোমার সঙ্গে । হাসতে হাসতে বললে, আরে, অবৈধ না হলে সে প্রেম প্রেমই নয় ।

বুক থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে গেল । সুবিমলের শরীরে মনে তখন একটা আনন্দের ফোয়ারা ।

আশান্বিত হয়ে সুবিমল বললে, কথাটা সত্যি । অবৈধ না হলে, পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দেখো না, অবৈধ প্রেমই গভীরতা পেয়েছে ।

নিজের বাহু দিয়ে সুবিমলের বাহুতে একটা জোর ধাক্কা দিল রঞ্জনা ।—আধাবুড়ো লোকরা টিনএজ মেয়েদের এই সব বলে ফুসলে নিয়ে যায় । দুজনেই হেসে উঠল ।

সুবিমল হাসি থামিয়ে বললে, তা বলে তুমি আমাকে এভাবে ধাক্কা দিলে । আরেকটু হলে তো পড়ে যেতাম ।

—দ্যাখো সুবিমল মিথ্যে বলো না । তুমি তো আমাকে ছোঁয়ার জন্য কখন থেকে অস্থির হচ্ছ । তাই তোমাকে একটু স্পর্শ পেতে দিলাম । 'স্পর্শ' শব্দটা পরিহাসের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল ।

সাহস পেয়ে সুবিমল ওর হাতটা ধরল । —তা হলে ভাল করেই স্পর্শ করি । ছুঁয়ে দেখি বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে ।

কিন্তু হাসতে হাসতে রঞ্জনা হাত ছাড়িয়ে নিল ।—তোমার বউ দেখে ফেলবে, বউ দেখে ফেলবে ।

—দেখে দেখবে, আমি কারও পরোয়া করি না । প্রত্যেকটা মানুষের সুখী হবার অধিকার আছে ।

—সত্যি ? ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে রঞ্জনা মুখোমুখি হল সুবিমলের । বললে, এত সাহস ছিল কোথায় এতদিন । কে জোগাল এ সাহস ?

সুবিমল বললে, তুমি ।

রঞ্জনা বলে উঠল, না বাবা, আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না । দোষ দিয়ো না । একটা নিরপরাধ মেয়ের অভিশাপ কুড়োতে পারব না ।

সুবিমল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল । রঞ্জনাও চুপচাপ হেঁটে চলেছে ধীর পায়ে ।

—কি ভাবছ ?

—কিছু না । তুমি পাশে থাকলে আর কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করে না ।

সুবিমল বললে, কিন্তু সত্যিই ওর বুকের মধ্যে তখন একটা বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা । কল্যাণী সম্পর্কে । যেন একটা ফুল ছড়ানো পথ বেয়ে ও হেঁটে চলেছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে কল্যাণী কখন নিঃশব্দে গোপনে কাঁটা ছড়িয়ে রেখে গেছে ।

—এত দেরি করলে আজ ? আমার এমন ভয় ভয় করছিল । বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী বলল ।

আবার একটা মিথ্যে অজুহাত দিতে বাধ্য করছে কল্যাণী । সারা শরীর কাঁটা হয়ে গেল । একটা ক্ষিপ্ত শজারু তার সারা গায়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে কাঁটা ফুলিয়ে রাগে ফুঁসছে যেন । জবাব দিতেও ইচ্ছে হল না ।

বেশ শান্ত গলায় কল্যাণী বললে, তোমার আগে তো কখনও এত দেরি হত না । কখন থেকে যে কেবল ঘর আর বার করছি । আজকাল রাস্তাঘাটে এত অ্যাকসিডেন্ট, দেরি হলেই ভয় করে ।

—অ্যাকসিডেন্ট ! ঠাট্টার স্বরে বললে সুবিমল ।

মনে মনে বললে, অ্যাকসিডেন্টই তো । আজ নয় । তোমাকে বিয়ে করাই আমার জীবনে একটা অ্যাকসিডেন্ট ।

মুখ ফুটে সে-কথা বলতে ইচ্ছে হল না ।

ওর শরীরটাই তখন বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে । মন পড়ে আছে রঞ্জনার কাছে ।

পরের দিন অফিসে পরিতোষকে ও বলেই ফেলল ।

ইংরিজি করে বললে, আই লাভ হার ।

—লাভ ? ঠাট্টার সুর পরিতোষের গলায় । ঠাট্টার ছলেই বললে, একেবারে লাভ ! এল ও ভি ই ! চার অক্ষরের শব্দ !

ছয়

কল্যাণী চিঠিটা পড়ে বিপর্যস্ত বোধ করল । ওর মনে হল এর পিছনে নিশ্চয় কোনও ছলচাতুরি আছে । ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি করতে চায় সুবিমল । তার বা রিমির । হয়তো দু'জনেরই ।

রিমি সদ্য এম এ-র গণ্ডি পার হয়েছে । চোখের সামনে রিমিকে বড় হতে দেখতে দেখতে ও নিজেও যে বুড়িয়ে এসেছে সেটা খেয়ালই হয়নি । আগে নিজের ওপর যে ভরসা ছিল, যে আত্মবিশ্বাস, এখন আর তা নেই । নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরও সন্দেহ জাগে ।

শুধু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারে না । সুবিমল কেন বারবার ওকে বিরক্ত এবং বিভ্রান্ত করতে চাইছে । এও কি সম্ভব নাকি ! যে মানুষটার রিমির ওপর কোনও মায়া-মমতাই ছিল না, কল্যাণীর ওপর তো নয়ই, সে ওদের শান্তির সংসারে আবার অশান্তি বয়ে আনতে চাইছে কেন ।

রিমি যখন ক্লাস নাইনে, তখন একবার চেষ্টা করেছিল । অফিসে ফোন পেয়ে সে কী ভয় ! তারপর পরিতোষ । পরিতোষ বাড়িতে এসেও দেখা করেছে । বোঝানোর চেষ্টা করেছে কল্যাণীকে । 'একবারটি যদি আসেই সে, রিমিকে দেখতে, কী এমন ক্ষতি ।'

কল্যাণী বিদ্রূপের হাসি হেসেছে । বলেছে, এতকাল যার নিজের মেয়ে সম্পর্কে কোনও মায়া ছিল না, তার জন্যে হঠাৎ আজ প্রাণ উথলে ওঠার কারণ তো দেখছি না ।

আসলে মনে মনে ভেবেছে, এর পিছনে কোনও প্যাঁচ-পয়জার আছে । নিশ্চয় রিমির কোনও ক্ষতি করতে চায় ।

একদিন তো ডিভোর্সই হয়ে গেল । রিমির ওপর সব দাবি ছেড়ে দেওয়ার শর্ত মেনে নিতে হয়েছে সুবিমলকে । অ্যালিমনির টাকা দিতে হল না, উপরন্তু রঞ্জনাকে বিয়ে করে বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার পথ প্রশস্ত হল তার । একটা খারাপ মেয়ে, যে অপরের সুখের সংসার নষ্ট করতে পিছুপা হয় না, তার আবার বৈধ স্ত্রী আর অবৈধ স্ত্রী ।

ছোট মামা বলেছিল, ওরা বিয়েটিয়ে নিয়ে অতসব মাথা ঘামায় না । লিভ টুগেদার, বুঝলি না । ঠেকাবি কি করে । বড় জোর ওই গ্রাউন্ডে ডিভোর্স নিতে পারিস । তাও প্রমাণ করার ঝামেলা আছে ।

সুবিমলের বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে । হঠাৎ একদিন কোনও একটা দোকানে দেখা হয়ে গিয়েছিল । বলেছিল, কি ভুল করলে বৌদি । দাদা রঞ্জনাকে বাড়িতে এনে তুলেছে ।

জানার কোনও আগ্রহ ছিল না, তবু বললে, মা আপত্তি করেননি ?

—মার কথা শোনে কে । বাতে পঙ্গু, চোখে দেখে না ।

ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই । যে দুটো বছর কেঁদে-ককিয়ে টিকে ছিল ও, সে-সময় সবটুকু সমবেদনা ছিল কল্যাণীর ওপরই । ছিল বলেই, কল্যাণী টিকে থাকতে পেরেছিল । দু' বছরের রিমিকে নিয়ে ওরা তখনও মশগুল হত । রিমিকে দেখার জন্যে ওর মা একবার আসতেও চেয়েছিলেন । বোন একদিন এসেছিল, কনকনলিনী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দেখতে দেননি ।

তখন কল্যাণীরও প্রচণ্ড রাগ । ওদের সকলের ওপর ।

মাকে বলেছে, ঠিক করেছ ।

ওরা কেউ যদি আবার এতদিন বাদে দেখতে আসতে চাইত, বলা যায় না, এখন কল্যাণী অনেক নরম হয়ে গেছে, কুড়িটা বছর তো কম নয়, হয়তো আপত্তি করত না । কিন্তু সুবিমলকে ও একটা দিনের জন্যেও দেখতে দিতে চায় না, রিমিকে । ওটাই ওর প্রতিশোধ । 'আমার একটা মেয়ে আছে, কিন্তু জীবনে তাকে দেখতে পাইনি' বলতে হবে তাকে । সবাই জানবে । জানেই তো । পরিতোষ জানে যখন, অফিসসুদ্ধ লোক জানে । পাড়াপড়শিরা আরও । একটি ছেলে বা মেয়ের বাবার কাছে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে ।

কিন্তু হঠাৎ এই রিমির কুড়ি বছর বয়সে সুবিমলের কাছ থেকে এমন একখানা চিঠি পেয়ে কল্যাণী বিভ্রান্ত বোধ করল । কোনও কৌশল নয় তো ? রিমির বা তার ক্ষতি করার ।

আবার সেই একই কথা । একবার দেখা করতে চাই । একবার শুধু রিমিকে দেখতে চাই ।

এই কুড়ি বছরে কল্যাণী এমনই বদলে গেছে, এমন ভাবেই সুবিমলকে জীবন থেকে মুছে ফেলেছে, যে খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা দেখে সুবিমলের হাতের লেখাও চিনতে পারেনি । লেটার বক্স থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে ভেবেছে, এ আবার কার চিঠি ?

মুখখানা গম্ভীর হয়েই ছিল । হাত বাড়িয়ে মাকে দিল ।

—কার চিঠি ? মা চোখে সোনা রঙের চশমা আঁটল ।

—পড়েই দেখো না ।

সত্যি কথা বলতে গেলে, কল্যাণীর মধ্যে এখন কোনও রাগ বিদ্বেষ

তিক্ততা নেই । আসলে ওর জীবনে সুবিমলই নেই ।

—হুঁ ।

চিঠি পড়ে ভাঁজ করে আবার খামের মধ্যে ভরে কল্যাণীকে ফেরত দিলেন ।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একটু ভাবতে হচ্ছে ।

বিরক্তিতে ভুরু উঁচিয়ে কল্যাণী বললে, ভাববার কি আছে ।

—রাখ এখন । ভেবে দেখি ।

মা'র কথা শুনে হাসল কল্যাণী । মা কি সব কথা ভুলে গেছে নাকি । এখন আবার নতুন করে একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে চায় !

একটা দিনের কথা মনে পড়ল ।

ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকত না সুবিমল । থাকলেও, একেবারে নিঃশব্দে, জানতেও পারত না । বড়জোর তার মা বা বোনের সঙ্গে দু'চারটে কথা ।

সুবিমলের মা একদিন প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে বলো তো সুবুর ।

কল্যাণী বললে, রোগে ধরেছে ।

ও সেজন্যে সুবিমলের খোঁজখবর রাখাই ছেড়ে দিয়েছিল । রিমিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত । হঠাৎ কলিং বেল ।

দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, একটি মেয়ে ।

রঞ্জনাকে ওপর থেকে দেখে ঠিক চিনতে পারেনি ।

লক্ষ করলো, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ।

ততক্ষণে দ্রুত শার্ট প্যান্ট পরে নিয়ে নীচে নেমে গেল সুবিমল ।

ওপর থেকে কল্যাণী দেখতে পেল, সেই রঞ্জনা, মুখে হাসি, কিছুটা অনিচ্ছুক সুবিমলকে ট্যাক্সির মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল । নিজেও উঠে পড়ল ।

সেই রাতটা আর ফিরলই না সুবিমল ।

আসলে কিছু ঘটছে, ঘটে চলেছে, তা কল্যাণী বুঝতে পারত । মেয়েদের সব সময় সব কিছু চোখে দেখতে হয় না ।

কল্যাণীর ওপর সুবিমলের যে কোনও আকর্ষণ নেই, মন সরে গেছে, তা বুঝতেই পারত । দু'-একটা কথা কানেও এসেছে । তবু সেটা সন্দেহের মধ্যে আটকে ছিল ।

পরের দিন কল্যাণীও কোনও প্রশ্ন করেনি । সুবিমল নিজের থেকেও কিছু বলেনি ।

সুবিমলের মা কল্যাণীকে জিগ্যেস করতেই ঝাঁজিয়ে উঠেছে । বলেছে, আপনারই তো ছেলে, জিগ্যেস করুন না ।

বুঝতে পারছিল, বুঝতে পারছিল বলেই বুকের মধ্যে দহনজ্বালা ।

হঠাৎ একদিন ঠিক করে ফেলল, আর নয় । এভাবে অপমান সহ্য করে, ও এ বাড়িতে টিকে থেকেছে শুধু বাবা-মা'র কথা ভেবে । বাবা-মা কষ্ট পাবে ভেবে ।

কি ভাবেই বা বলবে বাবা-মাকে ।

সন্দেহ এক জিনিস, আর নিজের শরীর-মন দিয়ে বুঝতে পারা আরেক জিনিস । সেটা কল্যাণী অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে ।

ভেবেছিল, বাবা হয়তো বলে বসবে, তোর মিথ্যে সন্দেহ ।

মা বলবে, আরও দুদিন থেকেই দেখ না ।

ওরা সে-কথা কেউ বলল না । বলে বসল, বেশ করেছিস ।

মাস কয়েক পরেই পরিতোষ এসেছিল, নিজেই । সুবিমলকে না জানিয়েই ।

বললে, চলে এলেন ? ও তো তা'হলে আরও জাহান্নামে যাবে ।

আগে কিছু বলেনি লোকটা, অথচ সবই জানত । ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওর ওপরেও । বলে দিয়েছে, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না । আর কোনওদিন আসবেন না দয়া করে ।

কিন্তু এখন এ আবার কী উপদ্রব ! তবু ভাল যে চিঠি লিখেছে, অফিসে ফোন করেনি । করলে, সে আর-এক যন্ত্রণা ।

কল্যাণী এতখানি বিচলিত হল, তার কারণ ও আর কিছুদিন শান্তি চাইছিল । তারপরই ও একেবারে মুক্তি পেয়ে যাবে । মুক্তি । তখন আর কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না । না ওর, না রিমির ।

ছোটমামা দু'-একটা পাত্রের সন্ধান এনেছে ।

কল্যাণীকে বলেছে, তোর কিছু চিন্তা নেই ।

তবু চিন্তা থেকেই গেছে কল্যাণীর । ওর জন্যে ওর মেয়ের না কোনও ক্ষতি হয় । 'বাবা নেই' । কথাটা ছেলেবেলায় রিমিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে । ও জানে । এখন ওকেই তাড়া করছে । হয়তো ওই একটা কারণেই ভাল পাত্র জোগাড় করতে পারবে না । সবাই পিছিয়ে যাবে ।

কল্যাণী কিছু গোপন করবে না, করতে চায় না । সব জেনেশুনে কে-ই বা আসবে ।

ছেলেবেলা থেকে, পাহারা দিয়ে দিয়ে বড় করেছে । এখন মনে হয়, এতটা না করলেও চলত । হিয়া তো প্রেম করেই বিয়ে করে ফেলল, বেশ ভাল ছেলে । কই, ভুল তো করেনি ।

দু'-বছরের রিমিকে নিয়ে যখন চলে এসেছিল, তখন দুঃখে-অপমানে অসহায় লাগলেও বুকে সাহস ছিল অনেক বেশি । লোকে ওর নামে

অপবাদ দেবে ? দিক্ না, ও পরোয়াই করে না সে-সবের ।

এখন মাঝে মাঝেই ভয় করে ।

ছোটমামা পাত্রের খোঁজ আনলেও, কল্যাণীকেই তারা সন্দেহ করবে না তো ! ওর নামেই অপবাদ দেবে না তো ! ওর চরিত্র নিয়ে ! কাদা ছুঁড়ে দিলে মেয়েদের গায়েই লেগে থাকে । ওর সম্পর্কে পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন কী বলে বেড়িয়েছে তখন, ও তো কিছুই জানে না । ওই সুবিমলই হয়তো ওর ওপরে দোষ চাপিয়েছে । পুরুষরা কি ভাগ্য নিয়ে যে জন্মায়. জল থেকে উঠে এলে হাঁসের মতো, শুকনো খটখটে । ওদের সবই শেষ অবধি বৈধ হয়ে যায় ।

একসময় ডিভোর্স করতে চায়নি । ভেবেছিল, প্রতিশোধ নেবে । ওই রঞ্জনার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলবে, ও তো একটা রক্ষিতা ।

এখন সে-ই সুবিমলের বৈধ স্ত্রী ।

ওর পরিচয়, ও স্বামী-পরিত্যক্তা । স্বামীকে ও-ই যে পরিত্যাগ করে চলে এসেছে, লম্পট চরিত্রহীন স্বামীকে, সে-কথা কেউ বলবে না । বরং সন্দেহ করবে, ওর চরিত্রেই কোন গলদ ছিল ।

সেই সন্দেহ যদি রিমির ক্ষতি করে, তার চেয়ে সাংঘাতিক কিছু নেই ।

মা সেজন্যেই বোধহয় হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললে, ভেবে দেখি ।

কল্যাণীকেও ভেবে দেখতে হচ্ছে ।

মেয়ে বড় হ'লে একসময় বন্ধু হয়ে যায় । রিমি এখন কল্যাণীর বন্ধু হয়ে গেছে । একে একে সব কথাই ও বলেছে রিমিকে । দিনে দিনে, টুকরো টুকরো করে সব শুনিয়েছে ।

—আমি সব জানতাম, সব জানতাম । কল্যাণী বলেছে, মাঝে মাঝেই দু'-চার দিনের জন্যে উধাও হয়ে যেত । দূরে কোনও ডাকবাংলো, কি হোটেল ফোটেলে । নষ্ট মেয়েদের নিয়ে যেখানে যায় ।

—ব'লো না মা, আর ব'লো না । প্রায় কেঁদে ফেলেছিল রিমি । বলেছে, 'আমার বাবা' এ-কথা ব'লো না । ওই দুশ্চরিত্র লম্পট লোকটা আমার বাবা, ভাবতেও ঘেন্না । বড় কষ্ট হয় মা, কষ্ট হয় ।

সেজন্যেই মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হয়েছে রিমিকে । স্কুলে, কলেজে, বন্ধুদের সামনে । ওর মনে হয়েছে, সকলেই যেন ওকে নিয়ে বলা-কওয়া করছে ।

তারপর একদিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে । এভাবে গোপন ব্যথা লুকিয়ে রেখে লাভ কী ! এতে যন্ত্রণা আরও বাড়ে । ব্যথা পেলে চিৎকার করলে হয়তো স্বস্তি মেলে, তাই কষ্ট পেলে রুগীরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ।

রিমি হঠাৎ একদিন কলেজের এক বন্ধুকে বললে, আমার কথা সব

জানিস ?

—না তো, কি কথা ?

—কিছু জানিস না ?

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল ।

রিমি হেসে বললে, আমার বাবা নেই । মানে, মা বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল । একটা পাজি লোক, আর একজনকে আবার বিয়ে করে ।

কাউকে বলেছে, আমার মা যে কি কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছে । তোদের বাবা আছে তোরা বুঝবি না ।

আসলে বাবা থাকা যে কি, রিমি তাই জানে না ।

এইভাবে বলতে বলতে হঠাৎ যেদিন সুপ্রীতিকে বললে, সুপ্রীতি অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে ।—বাবাকে কোনওদিন দেখিসনি তুই ? অথচ বেঁচে আছেন ?

ঠোঁট উল্টে রিমি বললে, না, দেখিনি, দেখার ইচ্ছেও হয় না ।

—কেন ?

রিমি হেসে বললে, তাকে আমার বাবা মনে হয় না বলে, আবার কি ?

সুপ্রীতি অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর কথায় ।

তারপর বলেছে, একদিন না একটা লোক, ভদ্রলোক, সত্যি ভদ্র, আমাকে তোর নাম বলল । জিগ্যেস করল, চিনি কি না । বললাম, হ্যাঁ চিনি ।

আমাকে বললে, কলেজ ছুটির সময় এসে দাঁড়াব এখানে । তুমি শুধু ভিড়ের মধ্যে যাবার সময় সেই মেয়েটির কাঁধে হাত রেখো ।

সুপ্রীতি হেসে বললে, সেদিন তুই কলেজেই আসিসনি ।

রিমি সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললে, কে সে ?

—তা তো জানি না ।

—জানিস না, অথচ তোকে চিনিয়ে দিতে বলল, তুই রাজি হয়েছিলি । যদি খারাপ লোক হয় ! কি দরকার তার আমাকে চেনার ।

সুপ্রীতি হেসে বললে, সত্যি কথা বলব ? আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, পাত্রের বাবা কিংবা ওইরকম কেউ । সেজন্যেই দেখতে চাইছে তোকে ।

—কনে দেখা ? রেগে গেল রিমি । বললে, সে তো বাড়ি গিয়ে দেখবে ?

সুপ্রীতি হেসে বললে, কি জানি বাবা, ভাবলাম, হয়তো তোকেও দেখবে, তোর হাঁটাচলাও দেখবে ।

তারপর—বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তাই না ?

একদিন ওর সব বন্ধুরা কলেজ ছুটির পর গল্প করতে করতে ফিরছে, সুপ্রীতি বোধহয় বেশ খানিকটা পিছনে ছিল, হঠাৎ ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে রিমিকে বললে, ওই যে, ওই যে, সেই ভদ্রলোক ।

কাঁধে হাত রাখল না কিন্তু । রিমি রেগে গিয়েছিল বলেই হয়তো ।

রিমি চট্ করে ফিরে তাকাল । দেখতে পেল । হ্যাঁ, বেশ ভদ্রলোকের মতোই চেহারা, পোশাক-আশাক । কেমন বিবর্ণ মুখে মেয়েগুলোর মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে । হয়তো রিমিকে খুঁজছে ।

রিমি হঠাৎ থেমে পড়ে সুপ্রীতিকে বললে, আয় তো ।

মুখেচোখে বেশ রাগ । এক ভিড় ছেলেমেয়ে রয়েছে, ভয়ও হল না ।

গট্গট্ করে এগিয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের দিকে । ভয় পাবে কেন, তখন ও এম. এ. পড়ছে । কচি খুকিটি নয় ।

ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে রাগত স্বরে বললে, আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন ? কেন ? কে আপনি ?

রিমি দেখল, লোকটা রীতিমতো থতমত খেয়ে গেল ।

তারপর সামলে নিয়ে বললে, আমি তোমার বাবা ।

রিমি প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর রাগের স্বরেই বললে, আমার বাবা নেই ।

রিমির মনেও হল, সত্যি ওর বাবা নেই । এ লোকটা ওর বাবা ? কই, ওর তো সেরকম কিছুই মনে হচ্ছে না । ওর কাছে এই ভদ্রলোক শুধুই একজন রাস্তার অচেনা লোক । তার বেশি কিছুই নয় । একে ও বাবা বলে স্বীকার করতেও পারবে না ।

মা বলতে কি বোঝায়, ও জানে । মা মানে কুড়ি বছরের স্নেহ ভালবাসা, রাগ শাসন, আদরের হাত, রোগে সেবা ; অপরিসীম কষ্ট, একঘেয়ে চাকরি । দায়িত্ব, আরও কত কি । একটা মানুষ হঠাৎ এসে একজনের বাবা হয়ে যেতে পারে না ।

লোকটার মুখে করুণ মিনতি । বললে, তুমি আমাকে বাবা বলে স্বীকার করো বা না করো, আমি তো জেনে গেলাম তুমি আমার মেয়ে ।

সাত

পরিতোষ বলেছিল, এ কি করছিস সুবিমল, এ ঘোর অন্যায় । তোকে নিয়ে সকলেই আলোচনা করছে, তা জানিস

সুবিমল হেসে বললে, দেন আই হ্যাভ বিকাম সামবডি । দ্যাখ পরিতোষ, আমাকে কেউ কোনওদিন কোনও ইমপর্ট্যান্স দেয়নি । এই বিরাট অফিসের গণ্ডা গণ্ডা জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে আমিও ছিলাম নগণ্য ।

পরিতোষ বললে, আমিও তাই । কিন্তু তার জন্যে কোনও দুঃখ তো নেই ।

পরিতোষ আর সুবিমল একই সঙ্গে ঢুকেছিল এ অফিসে । দু'জনেই একটু একটু করে উন্নতি করে এই স্বচ্ছন্দ অবস্থায় পৌঁছেছে । আর সেই ইন্টারভিউয়ের দিনেই আলাপ হয়েছিল, দু'জনেই চাকরি পেয়েছিল । তাই বন্ধুত্ব এতই গাঢ় হয়ে গিয়েছিল । অন্য অনেকে ওদের কথাবার্তা শুনে ভেবে বসত ওদের এই অন্তরঙ্গতা ছেলেবেলার ।

সেজন্যে কেউ কেউ এসে পরিতোষকেই বলত, আপনার এত বন্ধু, এটা কি ভাল করছেন উনি ?

শুনে রেগে যেত পরিতোষ । যারা অভিযোগ করত তাদের ওপরও, আবার সুবিমলের ওপরও । কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব এমনই জিনিস যে, তার শত অপরাধও ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে । নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় না ।

মাঝে মাঝেই রঞ্জনা এসে হাজির হত, বেরিয়ে যেত একই সঙ্গে । ওদের দু'জনের মুখের ভাব দেখে, হাসাহাসি, ফিসফিস হাস্যপরিহাস দেখে কারও বুঝতে অসুবিধে হত না ।

ওদের ওপরওয়ালাও একদিন পরিতোষকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুবিমলবাবুর সঙ্গে একটি উৎকৃষ্ট সুন্দরী মেয়ের নাকি অ্যাফেয়ার চলছে ? গাট্‌স আছে মশাই, আমরা তো একটা স্ত্রী নিয়েই সামাল দিতে পারি না ।

কারও আলোচনায় একটু প্রশ্রয় থাকত, কারও কথায় মৃদু অভিযোগ ।

সুবিমল বলেছিল, তা হলে, আই হ্যাভ বিকাম সামবডি, কি বল । কেন জানিস ? প্রত্যেকটি লোকের, মুখে যাই বলুক, একটা অবৈধ প্রণয়ের ইচ্ছে আছে । সেজন্যেই কোনও একজনকে প্রেম করতে দেখলে

তাকে হিরো বানিয়ে ফেলে । যাদের ঈর্ষা হয় তারাই অপবাদ দেয়, উপদেশ দেয় ।

হেসে বলেছিল, এ অফিসে আই অ্যাম এ হিরো ।

পরিতোষ বুঝেছে, সুবিমল একটা নেশার মধ্যে পড়ে গেছে । ওকে ফেরানো দুঃসাধ্য । আশা ছেড়ে দিয়েছে । যাক্, জাহান্নামের পথে ও কতদূর যেতে পারে দেখা যাক ।

আর সুবিমল মনে মনে হেসেছে । কারণ তখনও রঞ্জনা ওর ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে । কারণ কিছুতেই সাহস করে কিছু বলতে পারছিল না ।

সারাক্ষণ ও অধীর হয়ে থাকত । কান যেন টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনির জন্যে অপেক্ষা করছে । যেদিন ফোন আসত না, মনে হ'ত পৃথিবীতে কোথাও কোনও আনন্দ নেই । হতাশায় ভেঙে পড়া মন নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াত এখানে-ওখানে, কখনও কোনও ভিড়ের রেস্তোরাঁয় এক কাপ চা নিয়ে বসে থাকত । মানুষজন, ভিড় কিছুই ওর চোখে পড়ত না । অথচ ফোন করতেও দ্বিধা ।

একদিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেষ অবধি রঞ্জনার অফিসেই ফোন করল ।

কে একজন উত্তর দিলে, উনি আজ আসেননি ।

আসেননি, আসেননি ।

রিসিভারের অপর প্রান্তের উত্তরটা শুনেই মনে হয়েছিল ওর বুকের ভেতরটা যেন মুহূর্তে শূন্যতায় ভরে গেল ।

নিজেই গিয়ে হাজির হয়েছে একদিন । ওর অফিসে । দূর থেকে রঞ্জনাকে দেখে এক ঝলক খুশি ওর চোখেমুখে উপচে পড়তে চাইল । কিন্তু পরমুহূর্তে মুখটা ম্লান হয়ে গেল ওর । পাশের টেবিলের একজনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে হাসতে হাসতে গল্প করছে ।

সুবিমলকে দেখতে পেয়েই রঞ্জনা ওর নিজের টেবিলে এসে বসল । সামনের চেয়ারে সুবিমল ।

রঞ্জনা মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সুবিমলকে চাপা স্বরে বললে, দুটো দিন আসিনি, তাতেই এত ছটফট করার কি আছে ।

ছুটির পর দু'জনেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল । যেতে যেতে রঞ্জনা বললে, এত প্রেম আমি কি ছাই জানতাম । ব'লে হেসে উঠল ।

সুবিমল কোনও কথা বলতে পারেনি । এ মেয়েকে কি মুখ ফুটে প্রেম জানানো যায়, নাকি কোনও অভিমান জানানো যায় ! অথচ ওর বুকের মধ্যে তখন কাঁটার মতো বিঁধছে ওই পাশের টেবিলের লোকটির সঙ্গে

হাসাহাসি । মানুষের মন বড় অদ্ভুত । রঞ্জনার মুখে যে হাসিটা দেখে ও কৃতার্থ বোধ করে, সেটাই যখন অপরকে উপহার দেয়, বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে ওঠে সুবিমলের । ঈর্ষা । হবে হয়তো ।

—আরে বাবা, ছটফট করব তো আমি । তুমি ওরকম করবে কেন ?

—তুমি ছটফট করবে আমার জন্যে ? সুবিমল হাসল ।

রঞ্জনা বললে, প্রথম দিন কে এসেছিল, মনে আছে ? আমি । আর তুমি তো ঠিকানাটাই ভুলে মেরে দিয়েছিলে ।

সুবিমল বলতে পারল না যে, অফিসের নামটা মনে ছিল, কিন্তু দ্বিধা এসে ওকে বাধা দেয় ।

গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে এল রঞ্জনার । বললে, একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে আছি । একখানা পুরো ঘর, ফিরে গিয়ে যেই খিল্ দিই ঘরে, সে যে কি দুঃসহ ।

সুবিমল মুখ ফুটে বলতে পারল না ওর জীবনটাও কি দুঃসহ । বাড়িতে অনেকগুলো মানুষ, তবু কি একা, নিঃসঙ্গ । কারণ কল্যাণীর সঙ্গ এখন আর ওর একেবারেই ভাল লাগে না । যেন একটা যন্ত্রণা, একটা বন্ধন ।

রঞ্জনা বললে, দুটো দিন জ্বর নিয়ে পড়েছিলাম, তোমার তো কপালে জলপটি দেবার জন্যে একটা বউ আছে । আমার ?

সুবিমল সাহস পেয়ে বললে, আমাকে একটা ফোন করে দিলেই পারিতে, একা মনে হ'ত না ।

রঞ্জনা হেসে বললে, মনে রাখব, পরখ করে দেখব পরে ।

—কেন আজ ? সুবিমল সাহস করে বলে ফেলল ।

আর রঞ্জনা হাসতে হাসতে বললে, না মশাই । এখন আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি ।

বাইরে দু'জনে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে একটা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে সুবিমল চিৎকার করে ডাকল, ট্যাক্সি !

কি আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল । সম্ভবত রঞ্জনাকে দেখে । ওরা বোধহয় সুন্দরী মেয়েদের খুব সমীহ্ করে ।

ট্যাক্সি ডাকতে দেখেই রঞ্জনা বললে, ট্যাক্সি কেন, কোথায় যাবে ?

সুবিমল বললে, জাহান্নামে ।

রঞ্জনা বললে, তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি ।

—সত্যি ?

—সত্যি ।

সুবিমল দারুণ খুশি হয়ে উঠল । তার চেয়ে বেশি সাহসী ।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে, আবছা অন্ধকার ।

মাঝবয়সী বিহারি ট্যাক্সি ড্রাইভার জিগ্যেস করল—কোথায় যাবে ।

দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে সুবিমল বললে, যিধার খুশি ।

একটু আগে রেস্তোরাঁর বিল্‌টা রঞ্জনাই মিটিয়েছে । সুবিমলের পকেটে এখন অনেক টাকা ।

'যিধার খুশি' কথাটা শুনেই রঞ্জনা সুবিমলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল । তারপর বললে, তুমি যে বললে জাহান্নামে যাবে ।

—যাব ।

একটু পরেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যখন ট্যাক্সিটা স্পিডে ছুটছে, কাঁধে হাত রেখে রঞ্জনাকে কাছে টেনে নিল সুবিমল, তারপর রঞ্জনাকে চুমু খেল ।

রঞ্জনা কোনও বাধা দিল না ।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বলে বসল, এটা কী হল ?

সুবিমল ওর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা দেখতে পেয়ে একটু অবাক হল । কোনও প্রতিবাদ করেনি বলেই ধরে নিয়েছিল রঞ্জনার সম্মতি আছে ।

সুবিমল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল । অন্ধকারের জন্যে রাগটা স্পষ্ট দেখতে পেল না ।

রঞ্জনা বলে বসল, তুমি আমার পারমিশন নিলে না কেন ।

—পারমিশন !

রঞ্জনা হেসে উঠে বললে, জানো, জীবনে এই প্রথম আমাকে কেউ চুমু খেল । অথচ তুমি সেটা আমাকে উপভোগ করতে দিলে না ।

কথাগুলো দুর্বোধ্য ঠেকল সুবিমলের কাছে ।

রঞ্জনা বললে, জীবনের প্রথম চুম্বন, তার একটা প্রস্তুতি থাকবে না ? এটা উপভোগ করার জিনিস, যেটা সারাজীবন মনে রাখব ।

'জীবনে এই প্রথম আমাকে কেউ চুমু খেল ।' কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল । বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল । অথচ রঞ্জনাকে দেখে ওর কোনওদিনই সে-কথা মনে হয়নি ।

ওর সারা মন-প্রাণ যেন আপ্লুত হয়ে গেল । কানে বাজতে লাগল একটু আগে রঞ্জনার কথা । 'তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি' ।

পরিতোষ বললে, সুবিমল, আমার মনে হচ্ছে তুই জাহান্নামে যাচ্ছিস ।

—যাচ্ছি না, অলরেডি চলে গিয়েছি । এখন আর ফেরার পথ নেই ।

—এখনও থাম । এখনও সময় আছে ।

—অসম্ভব, অসম্ভব। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না, জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে।

—তোর একটা বউ আছে, একটা মেয়ে হয়েছে।

মেয়েটাকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে না। রঞ্জনা আমাকে ভালবাসা দিয়েছে, ভালবাসা চিনিয়েছে।

সুবিমল তলিয়ে গেল, তলিয়ে গেল। হয়তো জাহান্নামেই।

কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। প্রথম প্রথম সেটা ছিল শুধুই সন্দেহ। স্ত্রীর ওপর থেকে স্বামীর মন সরে গেলে যে-কোনও স্ত্রী তা বুঝতে পারে। আর তারপরই তার মনে হয় সে শুধু এ-বাড়ির দাসী। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু শেষ অবধি কল্যাণীকে সেই ফিরে আসতে হয়েছে, দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে।

জন্মের পর যে মেয়েকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়নি, সেই মানুষটা আজ এত বছর বাদে সেই মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছে কল্যাণী বুঝতে পারে না।

অস্থির হয়ে উঠেছিল বলেই ও ভেবেছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। একটা দিনের জন্যেও রিমিকে দেখতে দেবে না। অনুশোচনা হয়েছে বলেই সুবিমলকে ক্ষমা করে দিতে পারবে না।

কল্যাণীর মনে পড়ে যায়, রিমি তখন স্কুলে পড়ে, বছর পনেরো বয়েস, হঠাৎ একদিন ওকে ফোন করে বসেছিল সুবিমল। বিব্রত বোধ করেছিল ও, কী ভয়-ভয়! আবার রাগ এবং বিদ্বেষ। রিসিভার নামিয়ে দিয়েছিল।

দিন কয়েক পরেই পরিতোষের আবির্ভাব ওদের বাড়িতে।

ভেবেছিল, তারপর আর বিরক্ত করবে না। জীবন থেকে যাকে মুছে দিয়েছে একেবারে, তার অনুতাপকে কী করে মেনে নেবে কল্যাণী।

কল্যাণী ভুলেই গিয়েছিল।

আজ এত বছর বাদে, রিমির বয়স এখন কুড়ি, সুবিমলের জীবন থেকেও তো রিমি আর কল্যাণী একেবারে মুছে যাওয়ার কথা।

কল্যাণী তো মুছে গেছেই, কিন্তু রিমিকে দেখার জন্যে এত আগ্রহ কেন তার? এই এত বছর বাদেও।

ও বুঝতে পারে না। সন্দেহ হয় এটাও কোনও কৌশল। রিমির কোনও ক্ষতি করতে চায় হয়তো।

তা না হলে কল্যাণীকে চিঠিটা লিখেছে কেন? এমন অনুনয় করে। এত আকুল উপরোধ ছিল কোথায়।

কল্যাণী মনে মনে ঠিক করল, রিমিকে সাবধান করে দিতে হবে ।

—কোনওদিন যদি কেউ তোর সঙ্গে দেখা করে, বাবা এই পরিচয় দেয় ...

রিমি মাকে কথা শেষ করতে দেয়নি । বলেছিল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেব তার গালে । সেই দুশ্চরিত্র লম্পট লোকটাকে আমি 'বাবা' বলে স্বীকার করব কি করে । সে তো আমার কাছে একটা অচেনা লোক, তার বেশি কিছু নয় ।

শুনে মনের মধ্যে শান্তি পেয়েছিল কল্যাণী । ওর তো ওই একটাই ভয় । 'বাবা' পরিচয় দিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেই রিমি হয়তো একটুখানি আদর পেয়ে গলে যাবে । আর কল্যাণীর মনে হবে তার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে । হেরে যাবে সুবিমলের কাছে ।

বাবা পরিচয় কি সত্যি এত বড় ? যার কাছে কল্যাণীর এই সারাজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অসীম স্বার্থত্যাগ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা, সব মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে । বুক দিয়ে আগলে আগলে এই যে মানুষ করে তুলেছে রিমিকে, রিমি এখন কুড়ি বছরের, ও কি এখন বাবাকে ফিরে পেলে মাকে তুচ্ছ মনে করবে ?

সেজন্যেই বড় ভয় ছিল কল্যাণীর ।

ওর মনে পড়ে গেল স্কুলে প্রথম ভর্তি করার সময় কি প্রবঞ্চনা করতে হয়েছে ।

'মা' । একটা ছোট্ট শব্দ । তা নিয়ে দেশে দেশে কত কাব্য-সাহিত্য, কত গান । কত শ্লোক । অথচ বাস্তব জীবনে তার এতটুকু মূল্য নেই । একটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে হলে সেই মা'র কোনও স্বীকৃতি নেই । বাবার সই চাই, বাবার । বাবাকে একবার আসতে হবে, তা না হলে ভর্তি হবে না । বাবা নেই কেন ? হাজারও প্রশ্ন । কেমন সন্দেহের চোখ তুলে তাকানো । কিংবা আড়ালে উপহাস ।

সুবিমলের চিঠিটা পড়েই বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল । নিয়ে গিয়ে দিল মাকে ।

কনকনলিনী চোখে সোনা রঙের চশমাটা এঁটে পড়লেন । বললেন, ভেবে দেখি ।

পরে বললেন, রেগে গিয়ে কিছু লিখে বসিস না যেন ।

ছোটমামা আসতেই চিঠিটা পড়তে দিল কল্যাণী । না পড়তে দেওয়ার মতো তো কিছুই নেই । কল্যাণী সম্পর্কে কোনও কথাই নেই । কোনও অনুশোচনাও নেই । অথচ কল্যাণীকেই লেখা । সবটুকু শুধু রিমিকে ঘিরে । যেতে চাই, কথা বলতে চাই ।

ছোটমামা বললে, ভেবেচিন্তে দেখ, একবার না হয় এলই ।

কল্যাণীর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে ।—কি বলছ, ছোটমামা ।

—ঠিকই বলছি, ভেবে দেখ ।

ছোটমামা ধীরে ধীরে বললে, রিমির বিয়ে নিয়ে ভাবি না, দু'-একটা ভাল পাত্র আমার হাতেই আছে । সব জেনেশুনেই বিয়ে করবে । কিছুই লুকোতে হবে না । তবু, ওর বাবা এসে যদি সম্প্রদান করে যায়, কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না । সব অপবাদ মুছে যাবে ।

কল্যাণী হেসে উঠল ।—সেই অপবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই তো আমার সারা জীবন কেটে গেল । ঠিক যখন মনে হচ্ছে আমি জিতে গেছি, তখনই আমাকে হেরে যেতে বলছ ছোটমামা !

ছোটমামা হেসে বললে, কি করবি বল ? একটা স্কাউন্ড্রেল বাবাও এই সমাজে সব সময় জিতে যায় । সমাজ যে বাবাদের তৈরি । আর সব মেয়েই সেটা মেনে নিতে অভ্যস্ত ।

কল্যাণীর সারা গা জ্বালা করে উঠল । আবার নতুন করে নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগল । মূল্যহীন । মনে হল, আমার কোনও দামই নেই ।

মা সেজন্যেই বলেছে, ভেবে দেখি । ছোটমামা তো স্পষ্টই বলে দিল ।

অর্থাৎ এখন রিমির জন্যে, রিমির স্বার্থ ভেবে, সেই সুবিমলকেই মাথা নিচু করে ডেকে আনতে হবে ।

ও তো শুধু একবার আসতে চেয়েছে, দেখা করতে চেয়েছে । হয়তো একটু আদর দেখাবে ।

কল্যাণীকে নরম করে একটা চিঠি লিখতে হবে । যাকে দেখতেও ইচ্ছে করে না, তাকেই ।

হেসে কথা বলতে হবে । হয়তো ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতেই ।

চলে যাবার সময় মুখে হাসি এনে বলতে হবে, আবার এসো ।

কারণ রিমির বিয়ের সময় সকলে বলবে, ওর বাবা নিজে সম্প্রদান করছে ।

কল্যাণী যেন আর ভাবতে পারছে না । এখন মনে হচ্ছে নিজের পরাজয়ের চেয়ে রিমির জয়টাই বড় । রিমির জীবনটা যেন সাফল্যে ভরে ওঠে । সুখী হয় । যেন কোথাও কোনও কাঁটা না থাকে ।

সব কাঁটা কল্যাণীর বুকের মধ্যেই থাক । রিমির চলার পথে একটাও না ।

ভাবতে ভাবতে একসময় কল্যাণীর মন খুশিতে ভরে উঠল । ও ভাবলে, এটাকে আমি পরাজয় মনে করছি কেন । এটা আমার জিত ।

সকলেই বলবে, সেই কল্যাণীর কাছেই তো ফিরে আসতে হল ।

কার জন্যে ফিরে আসছে সেটা বড় কথা নয় । কার কাছে ফিরে আসতে চাইছে সেটাই বড় কথা । কে জানে, হয়তো কল্যাণীর কাছেই ফিরে আসতে চাইছে । সেটুকু বলার সাহস হয়তো হারিয়ে ফেলেছে । সেজন্যেই রিমিকে দেখতে চাওয়া, আসার ইচ্ছে ।

—রিমি, তোর বাবা একবার আসতে চাইছে, কি জবাব দেব বল ।

হাসতে হাসতে বললে কল্যাণী । বললে, চিঠি লিখেছে ।

রিমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল । তারপর বললে, আসতে যখন চাইছে, আসুক না । তুমি যদি চাও...

—বলছিস ?

ঘাড় নাড়ল রিমি ।

কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটল । আঃ, এই একটাই ভয় ছিল ওর । মেয়েকে । হয়তো বলে বসবে, আসতে দিয়ো না । আমি ওকে 'বাবা' বলতে পারব না ।

তার বদলে রিমি বলছে, আসুক না ।

কিন্তু একটা কথাই রিমি শুধু গোপন করে গেল । গোপন করে এসেছে । বলতে পারল না, বাবাকে আমি দেখেছি ।

বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল ও । স্পষ্ট মনে পড়ল না । ঝাপসা মতো ।

সুপ্রীতি বলেছিল, বাবার সঙ্গে তুই ওভাবে কথা বললি ? যত দোষই থাক্, বাবা তো ।

তার পরেও এসেছে সুবিমল । রিমি দেখাই করেনি ।

সুপ্রীতি একদিন বললে, কত দুঃখ করছিলেন তোর বাবা, তুই দেখাও করলি না । তোকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন বাড়িতে । কি যেন দেখাবেন ।

জানার আগ্রহ হয়নি রিমির, কি দেখাবে । ওই বাড়িতে ! ওটা তো শত্রুপক্ষের বাড়ি । যে বাড়ি থেকে মা অপমানিত হয়ে একদিন চলে এসেছিল, যে বাড়ির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কই নেই, সে বাড়ির চৌকাঠে পা রাখতেও ওর অসীম ঘৃণা ।

—কিন্তু তুই তোর মায়ের দিকটা ভেবে দেখছিস না রিমি । হয়তো তোকে উপলক্ষ করে উনি আসছেন, তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন । আসলে তোর বাবা হয়তো তোর মায়ের কাছেই ফিরে আসতে চাইছেন ।

সুপ্রীতি বলেছিল, তোর মা কি চায় সেটা তো আগে বুঝবি ।

কথাগুলো রিমির মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে আর ঘুরপাক খেয়েছে ।

শেষে একদিন সুপ্রীতিকে বলেছে, সেই লোকটা যদি আবার কোনওদিন আসে ...

—লোকটা বলছিস কেন, ও তো তোর বাবা ।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে ও সুপ্রীতির দিকে । যেন এই 'বাবা' কথাটাই ওর অপছন্দ ।

তারপর বলেছে, সে এলে বলিস, দেখা করব, কি বলতে চায় শুনব ।

ওরা দু'জন একদিন ইউনিভার্সিটির গেট পার হয়ে বেরিয়েছে, দেখতে পেল, লোকটা, লোকটা ভাবছে কেন রিমি, দেখে দিব্যি ভদ্রলোক মনে হচ্ছে, দেখল উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে ।

—চল্ । রিমি বলল । ওর মনে একটা কৌতূহল । তাছাড়া আর কিছুই নয় ।

ওদের রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতে দেখে সুবিমলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । সাহস করে সুবিমলও দু'পা এগিয়ে এল ।

—রিমি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না । কতদিন ইচ্ছে হয়েছে তোমার কাছে আসতে, তোমাকে দেখতে । কিন্তু সাহস হয়নি । তোমাদের কাছে আসার যে আর মুখ ছিল না আমার । কোন্ মুখ নিয়ে আসব । আমি জানতাম, তোমাদের ওপর অন্যায় করেছি, অবিচার করেছি ।

অনুনয়-ভরা কথাগুলো রিমিকে স্পর্শও করছিল না । কিন্তু সুপ্রীতির মুখ দেখে ওর মনে হ'ল সে যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে । হয়তো তা দেখেই লোকটার প্রতি একটু সমবেদনা জাগল । হ্যাঁ, লোকটা ! ওকে ও কিছুতেই বাবা বলে ভাবতে পারছে না ।

—চলো, একবার আমার বাড়িতে চলো তুমি । দেখবে তোমাকে আমি কোনওদিনই ভুলিনি ।

বিদ্রূপে হেসে উঠল রিমি ।—আপনার বাড়িতে ! সেখানে তো একটা ডাইনি থাকে । আমাদের শত্রুপক্ষ ।

থমকে গেল সুবিমল । বলল, ও-কথা ব'লো না রিমি । তুমি তাকে দেখোনি, জানো না । সেও তোমাকে কোনওদিন দেখেনি । কিন্তু তোমার জন্যে, তোমাদের জন্যে তার কত মায়া । ভাবতেও পারবে না ।

রিমি হেসে উঠেছিল ।—সেজন্যেই বুঝি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল ।

সুবিমল বললে, দোষ তার নয় রিমি, সব দোষ আমার ।

একটু থেমে বললে, সে-ই বারবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি সাহস পাইনি, লজ্জায় যেতে পারিনি, তবু সে-ই সাহস দিয়েছে, বারবার তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—এত মায়া! এত নিঃস্বার্থ! ঠাট্টার স্বরে বলেছে রিমি।

সুবিমল নিজের মেয়ের কাছে কি করে বলবে, যে রঞ্জনা সত্যিই নিঃস্বার্থ। একটাই স্বার্থ ছিল তার। যে স্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। যেমন রঞ্জনাকে ছেড়ে আসা আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সেই স্বার্থের নাম ভালবাসা। প্রেম।

—আঃ, অবৈধ প্রেম, গ্র্যান্ড। ঘরে সুবিমলের স্ত্রী আছে শুনেই সেই দ্বিতীয় দিনেই উল্লাসের স্বরে বলে উঠেছিল রঞ্জনা।

তখন বোঝেনি সুবিমল। শুধুই উপহাস মনে করেছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে একটা নেশার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।

নিজের মেয়ের কাছে সব কথা বলা যায় না। বলতে পারেনি।

তবু অনুনয়ের স্বরে বলেছে, তাকে ডাইনি ব'লো না রিমি। সে অন্যরকম মানুষ, কারও সঙ্গে মেলে না। তোমার ওপর অবিচার হবে মনে হয়েছে বলেই কোনওদিন সে ছেলেমেয়ে চায়নি। এর চেয়ে বড় স্বার্থত্যাগ কে করতে পারত, বলো।

শুনতে শুনতে কেমন অবিশ্বাস্য লেগেছে। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে সেই ডাইনি মেয়েটাকে দেখার। ডাইনি মেয়ে, নাকি তাকে ডাইনি-মা বলবে ও?

সত্যি সত্যি ওর যেতে ইচ্ছে হয়েছে। একটা অদ্ভুত কৌতূহল। ফেলে আসা মাতৃভূমি দেখতে যাওয়ার আগ্রহ যেন। ওখানেই তো মা ছিল, মা'র নিজস্ব স্বর্গ ছিল একদিন, ওখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে ও। বিতাড়িত হয়েছে। যাবে না একদিন দেখতে? মা কী হারিয়ে এসেছে জানতে?

রিমি বললে, যাব। যাবি সুপ্রীতি? তুইও চল।

সুপ্রীতি রাজি হয়ে গেল। হয়তো বন্ধুর প্রতি সমবেদনায়। যদি একজন তার বাবাকে ফিরে পায়।

ওরা গিয়েছিল।

রঞ্জনাকে দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। তার ব্যবহারেও। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এই সুন্দর স্বভাবের মহিলা, সুন্দর চেহারার, একেই ও এতকাল ডাইনি ভেবে এসেছে!

ছোটমামা বলেছিল, উইচ।

কই, একটুও তো মিলছে না।

—রিমি তোমাকে আমি কোনওদিন ভুলিনি, এই দ্যাখো ।

আলমারি থেকে একরাশ কাগজপত্র বের করে এনে দিয়েছে রঞ্জনা, হাসতে হাসতে বলেছে, দেখাও, দেখাও ওকে ।

একটার পর একটা কাগজ খুলে দেখিয়েছে সুবিমল ।

—এই দ্যাখো । পড়ে দ্যাখো । এ-সবই তোমার নামে ।

টাকা, টাকা, টাকা ।

সুবিমল বলেছে, জীবনে যা-কিছু জমাতে পেরেছি, সবই তোমার নামে । সেখানে তোমার এই নতুন মা কোথাও কোনও ভাগ বসায়নি । সব তোমার ।

—এই দ্যাখো, তোমার বিয়ের জন্যে কত গয়না গড়িয়ে রেখেছি ।

আলমারি থেকে এনে দেখিয়েছে সুবিমল ।

এত টাকা, এত গয়না, এত ভালবাসা ওর অজ্ঞাতে এতদিন জমা ছিল, ও জানতেও পারেনি । অথচ এ-সব কিছুই না থেকে যদি জানতে পারত শুধু ভালবাসা আছে, তা'হলে জীবনভর এত যন্ত্রণা পেত না, এত লজ্জা । সঙ্কোচ এসে সব সময় ওর মাথা নিচু করে দিত না ।

শুধু ভালবাসা ? ওর তো এখন কুড়ি বছর বয়েস, ও এখন কল্পনাও করতে পারে । বুঝতে পারে । আর এক ধরনের ভালবাসার জন্যে মানুষ কতখানি পাগল হয়ে যেতে পারে । মায়ের দুঃখ, লজ্জা, অপমান সব ভুলে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর ইচ্ছে হয় এই দুটি অপরাধী মানুষকে ক্ষমা করে দিতে । ক্রিমিনাল ওরা দু'জনেই, কিন্তু মনে হ'ল দু'জনেই মানুষ । কোথাও যেন মানুষের চেয়ে বড় ।

রিমি কি আচ্ছন্ন বোধ করছিল ? নিজেকেই ভয় হচ্ছিল ওর ?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি ।

তারপর সুবিমল আর রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললে, আমি এসেছিলাম এ-কথা মা যেন কোনওদিন জানতে না পারে ।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রীতিকে বললে, জানিস সুপ্রীতি, এত সব দেখাল, যখন দেখাচ্ছিল টাকা, গয়না, সত্যি বলছি লোভ হচ্ছিল । অথচ এখনও লোকটাকে আমি 'বাবা' মনে করতে পারছি না ।

এ-সব কথা কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও মাকে জানতে দেয়নি রিমি । জানাতে পারেনি ।

কল্যাণী বললে, তোর বাবা একটা চিঠি দিয়েছে । একবার আসতে চায় । কি জবাব দেব বল ।

একটু হেসে বললে, তোর ওপর চিরকাল তো আমার ইচ্ছেটাই

চাপিয়ে এসেছি।

কেন আসতে চায় তা সবই জানে রিমি।

তবু কথা শুনে মনে হ'ল, মা'র ভিতরে ভিতরে বোধহয় একটা চাপা ইচ্ছে আছে। যৌবনের দিন অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। জীবনেরই বা কতটুকু বাকি। তবু, যার কাছ থেকে একদিন লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল, আজ তাকেই আবার ফিরে আসতে হচ্ছে, নতমস্তকে, সেটুকুই হয়তো মা'র বাসনা। ক্ষমা করার। তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি হতে পারে।

--কি জবাব দেব বল্। কল্যাণী আবার জিগ্যেস করল।

রিমি বললে, আসুক না।

আসলে রিমি নিজেও যে মনে মনে লোকটাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এমন কি ওই সুন্দর স্বভাবের—এখন একটু একটু চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় রূপের ঝরনা ছিল তার গায়ে, মাদকতা—সেই ডাইনি মেয়েটাকেও—এখন মহিলা—তাকেও ও ক্ষমা করে দিয়েছে।

ওই টাকার, ওই গহনার লোভ ? না অন্য কিছু ?

আট

একটাই কাজ বাকি ছিল কল্যাণীর। রিমির বিয়ে। এই দিনটির কথা ভেবে কত না স্বপ্ন দেখেছে। ওর জীবনে আর কোনও সুখস্বপ্ন ছিল না। নিজেকে এতকাল বেঁধে রেখেছে কর্তব্যের বন্ধনে। রিমির বিয়ে দিয়ে তবে ওর কর্তব্যের শেষ। তারপর ওর মুক্তি এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

ভেবেছিল তারপর আর কোনও আশঙ্কা থাকবে না। একটাই তো ভয় ছিল, যা ওকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই একটা শূন্যতার মুখোমুখি হতে হয়, কানের দু'পাশে সাদা চুলগুলো, রিক্ত সিঁথির দু'পাশে, সারা মাথায় লুকিয়ে থাকা সাদা চুলের রাশি যেন ওকে উপহাস করে। তবু তারই মধ্যে একটা গর্ব উঁকি দিয়ে গেছে। আমি এখন আর সেই অসহায় দুঃখী মেয়ে নই। আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। রিমিকে মানুষ করে তুলেছি।

ছোটমামা একদিন প্রশংসা করে বলেছিল, তুই তো সবাইকে অবাক করে দিয়েছিস কল্যাণী। যারা এতদিন তোকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, অপবাদ ছিটোনোর চেষ্টা করেছে, এখন তারাই তোর প্রশংসা করে।

কল্যাণী তা জানে।

পুরনো দিনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সব খবরই সে রাখত কল্যাণীর। সে বলেছিল, তুমি দেখালে কল্যাণী, মেয়েদের তোমার মতোই হওয়া দরকার।

মেজমাসি একদিন এসে বললে, সব মেয়েই তো শুধু কাঁদে আর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়। যেন আর কোথাও যাবার নেই। কল্যাণী, তোকে দেখলেও আমাদের মেয়ে বলে গর্ব হয়।

কল্যাণী জানে, এখন আর ওকে কোথাও মাথা নিচু করে চলতে হয় না। রিমির এখন আর কোনও লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। যারা উপহাস করত, আড়ালে আলোচনা করত, তারাই এখন মাথা নিচু করে চলে।

অনেকদিন আগে রিমি একবার ওর গা ঘেঁষে বসে ধীরে ধীরে বলেছিল, জানো মা, যেদিন তুমি বললে, আমার বাবা একটা দুশ্চরিত্র লম্পট, একটা ডাইনি তাকে গ্রাস করেছে, সেদিন আমি সারা রাত কেঁদেছিলাম। তখন আমার কি লজ্জা, কি লজ্জা। আমি নিজেকে

লুকিয়ে ফেলতে চাইতাম । যেন আমিই কোনও পাপ করে বসেছি ।

কল্যাণী বলেছে, এই পৃথিবীটা কি অদ্ভুত দেখ । যে অপরাধ করে সে কিন্তু লজ্জা পায় না, যাদের কোনও অপরাধ নেই, লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় তাদেরই । তুই কি এখনও লজ্জা পাস নাকি ?

রিমি হেসে উঠে বলেছে, না মা । এখন আর আমার কোনও লজ্জা নেই, কারণ আমি নিজেই এখন বলে বেড়াই । আমার বাবা খারাপ, খারাপ । আমার মা সহ্য করতে পারেনি বলেই চলে এসেছিল । ব্যস্, কিছুই লুকোই না বলেই এখন আর আমার নিজেকে লুকোতে হয় না ।

কল্যাণী হেসে বলেছে, জিত তো আমাদেরই হয়েছে রে, আমরাই জিতে গেছি । তোকে আমিই একা-একা মানুষ করে তুললাম, এর চেয়ে বড় জিত আর কি আছে । এরপর একদিন তোর বিয়ে দেব । সেই অমানুষটাকে জানতেও দেব না । আমি সম্প্রদান করব তোকে, দেখে নিস্ ।

সেই অহঙ্কারের কথাটাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কল্যাণীর ।

সুবিমলের চিঠিটা পেয়ে একটুও বিচলিত হয়নি । কেন হবে ? এই কুড়িটা বছরে অনেক, অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে সুবিমল । কল্যাণী তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেছে তাকে । খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা দেখে প্রথমে বুঝতেই পারেনি কার হাতের লেখা ।

চিঠিটা পড়ে মনে মনে হেসেছিল । নৃশংস একটা আনন্দ । সেই পরিতোষ যেদিন এসেছিল বাড়িতে, ঠিক সেদিনের মতোই । একটু সন্দেহও হয়েছিল, কোনও ছলচাতুরি নেই তো এর মধ্যে । তা না হ'লে এতকাল পরে হঠাৎ তার এ আকূতি কেন ।

পরিতোষের সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল । গর্ব করে সেদিন বলে ফেলেছে, রিমি এম. এ. পড়ছে, এম. এ. । গর্ব করে বলেছে, সবাই ভেবেছিল আমরা তলিয়ে যাব, যাইনি । কী বলেন ।

হাসতে হাসতেই বলেছে কল্যাণী ।

না, সুবিমলকে শোনানোর জন্যে নয়, পরিতোষকেও নয় । ও আসলে হয়তো নিজেকেই শুনিয়েছে ।

তারপর হঠাৎ একদিন সুবিমলের এই চিঠিটা এল ।

চিঠিটা পড়ে একেবারেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ওটা এগিয়ে দিল কনকনলিনীর দিকে ।

ছোটমামা আসতেই তাকেও পড়াল ।

কনকনলিনী সোনা ফ্রেমের চশমাটা খুললেন চোখ থেকে, আঁচলে ঘষলেন কাচ দুটো । যেন এবার দূরের কোনও দৃশ্য স্পষ্ট করে দেখতে

চাইছেন ।

বললেন, রেগে গিয়ে হুট করে যেন কোনও জবাব দিয়ে বসিস না ।

কল্যাণী মনে মনে হেসেছিল । রাগ ? এখন আর তার বিরুদ্ধে কোনও রাগও নেই । কোনও অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়ে সেই গলিটা পেরিয়ে এসে কেউ কি তাকে চিরকালের জন্যে মনে রাখে ?

ছোটমামা বললে, তুই বরং একটু নরম করে একটা জবাবই দিয়ে দে । আসতে দে না একবার ।

—কেন ? কেন বলছ্ এ-কথা ?

ছোটমামা বললে, ভেবে দেখ, দু'দিন বাদেই তো রিমির বিয়ে দিবি । সুবিমল এসে যদি সম্প্রদান করে যায়, দেখায় ভাল । হাজার হোক বাবা তো !

প্রথমে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল কল্যাণী । এ কি কথা ছোটমামার মুখে ? ও তো ভাবতেই পারে না ।

ভিতরে ভিতরে কল্যাণীর নিজেরও একটু লোভ হচ্ছিল । সুবিমলের বিরুদ্ধে এখন তো ওর কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই । ভালবাসা কবেই চলে গেছে । তবু সবাই দেখুক ওর কাছেই তাকে মাথা নিচু করে আসতে হল । এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি আছে । যদিও ও জানে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটুকুও ওর নেই ।

তবু রিমির মতটা জানা দরকার ।

কি ভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না । কল্যাণী তো জানে বাবার বিরুদ্ধে কতখানি আক্রোশ লুকিয়ে আছে রিমির বুকে । আজ কি করে উল্টো সুরে ওকে বলবে, তোর বাবা একবার আসতে চায় ।

শেষ পর্যন্ত সেই বলতেই হল ।

আর রিমি বললে, আসুক না ।

কারণ ও মনে মনে ভাবল, মা হয়তো চায় । মা হয়তো সুখী হবে ।

সুবিমল এল ।

একটা ভীরু মানুষ ।

কলিং বেল বাজতেই কল্যাণী ধীরে ধীরে এসে সদর দরজার খিল খুলে দিল ।

কনকনলিনী দুপুরে ঘুমোন না । সারাটা দিন চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন । শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, বাসন্তীর মা এল বোধহয় । বাসন্তীর মা মানে ঠিকের লোক ।

কল্যাণী বললে, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি ।

দরজা খুলতেই কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল কল্যাণী ।

চোখ তুলে লোকটার চোখের দিকে তাকাতে পারল না ।

সুবিমল আসবে একদিন, জানত । ও নিজেই তো একটা ছোট্ট চিঠি লিখে জানিয়েছে, আসতে পার । লিখেছে, তোমারই তো মেয়ে, আমি বাধা দেবার কে ।

এইটুকু লিখতেও ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল । তবু লিখতে হয়েছে । মা বলেছে, রিমির জন্যে তোকে এটুকু করতেই হবে । ছোটমামা বলেছে, রিমির বিয়ের সময় ওর বাবা যদি সম্প্রদান করে, দেখায় ভাল ।

কল্যাণী শেষ অবধি ভেবেছে, সারা জীবনটাই তো আমি রিমির জন্যে উৎসর্গ করে এসেছি, আজ যদি শেষ গর্বটুকুও ত্যাগ করি, কি যায় আসে । আমি তো জানব, রিমির জন্যেই সেই গর্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি ।

'এসো' এই ছোট্ট কথাটাও উচ্চারণ করতে বাধল কল্যাণীব । ও শুধু দরজা খুলে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল । বসার ঘরে ।

শুধু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করল ।

মানুষটা এখন অচেনা । কোনওদিন যে কিছু ছিল, কোনও সম্পর্ক, তা মনেও হয় না ।

সুবিমল বসল । বসার ঘরে ।

কল্যাণীর কাছে ও এখন শুধুই একজন বসার ঘরের লোক, বাইরের লোক । আর এক পাও সে এগিয়ে যেতে পারবে না, ঢুকতে পারবে না এই বাড়ির ভেতর । এতকাল এই বসার ঘরে ঢোকার অধিকারটুকুও দেয়নি । দরজায় এভাবে কলিং বেল-এর বোতাম টেপার সাহসও ছিল না সুবিমলের ।

সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ, অপ্রতিভ মুখ নিয়ে সুবিমল প্রশ্ন করল, ভাল আছ ?

একটা কঠিন উদ্ধত মুখকে সহজ আর নরম করার চেষ্টা করল কল্যাণী । শুধুই ঘাড় নাড়ল ।

সুবিমল হয়তো কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না ।

আর কল্যাণীর কথা বলতে ইচ্ছেই হচ্ছে না ।

কনকনলিনী বলেছিলেন, যদি আসে, আসবেই, তখন একটু ভালভাবে কথাবার্তা বলিস যেন ।

ছোটমামা বলেছিল, একটু নয় আদরযত্ন দেখালি, চা-টা খাওয়ালি । পলিসি হিসেবেও তো মানুষ অনেক কিছু করে । ওকে আমাদের এখন

দরকার ।

কল্যাণী তা জানে । কিন্তু কেন দরকার হয় সেটুকুই জানে না । একজন পুরুষের কাছে শেষ অবধি মাথা হেঁট করানোর জন্যেই হয়তো দরকার হয় ।

কিন্তু কল্যাণী পারছিল না । সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে ওঠা কত কঠিন ।

এক ঝলক সুবিমলকে দেখল । রীতিমতো বুড়িয়ে গেছে, কল্যাণীর চেয়েও ।

সুবিমল সঙ্কুচিত । কথা খুঁজছে, খুঁজে পাচ্ছে না ।

হঠাৎ বললে, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি ।

একটা বিদ্রূপের হাসি এসে গেল কল্যাণীর ঠোঁটে । পাপের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি বলা যায়, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি ।

অসহ্য. অসহ্য লাগল কল্যাণীর ।

—রিমি ! ও চিৎকার করে ডাকল ।

রিমি এসে দাঁড়াল দরজার পরদা সরিয়ে, দূরেই দাঁড়িয়ে রইল ।

কল্যাণী বললে, তোমার বাবা ।

সুবিমলকে বললে, 'মেয়ে' । 'তোমার মেয়ে' কথাটা উচ্চারণ করতেও ইচ্ছে হল না ।

ওরা যে পরস্পরকে চেনে কল্যাণী জানেও না ।

সুবিমল কথা বলল, কল্যাণী কথা বলল, রিমি কথা বলল । অথচ ওদের কথা পরস্পরকে স্পর্শও করল না ।

রিমির ভয় ছিল, লোকটা না বলে বসে, রিমিকে চেনে, রিমি ওর বাড়িতে গিয়েছিল ।

মাকে সে-সব কথা ও বলতেই পারেনি । ভয়ে, নাকি মা দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে বলে, তা ও জানে না । কেন গিয়েছিল ? হয়তো শুধুই কৌতূহল । যে মেয়ে মা'র জীবনে এত দুঃখ কষ্ট এনে দিয়েছে, জীবনটাই ব্যর্থ করে দিয়েছে, সে কেমন মেয়ে দেখার আগ্রহ হয়তো ।

গিয়ে দেখেছে সকলেই কত স্বাভাবিক । সাধারণ মানুষেয় মতোই । কেউ শয়তান নয়, কেউ ডাইনি নয় । সাধারণ মানুষ কেন বলছি, তার চেয়েও বড় । তা হলে এমন কেন হয় ! দু' বছরের একটা বাচ্চা শিশুকে কোলে নিয়ে একজনকে কেন চলে আসতে হয় ।

ও চিরকাল জেনে এসেছে বাবা খারাপ, খারাপ । এখন দেখছে তা সত্যি নয় । অথচ লোকটাকে ও কিছুতেই বাবা বলে মেনে নিতে পারছে না । মনে হচ্ছে একটা অচেনা লোক । যার সঙ্গে ও কোনও তারে বাঁধা

পড়েনি ।

মাকে দেখেও মনে হল না, খুব একটা উৎফুল্ল, স্বামী ফিরে আসাতে খুশি । মা হেসেছে, কথা বলেছে, দোরগোড়া অবধি এগিয়ে এসেছে বিদায় দেবার সময় । কিন্তু সবটাই কেমন কৃত্রিম ।

অথচ ওর মনে হয়েছিল মা হয়তো ফিরে পেতে চায় । কেন চায় তাও বুঝতে পারেনি ।

মাকে জিগ্যেস করতে পারছিল না, মাকে বলেছে কি না, যে রিমির জন্যে সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করেছে যা কিছু, তা রিমির নামেই রেখে দিয়েছে । রিমির বিয়ের কথা ভেবে গয়না গড়িয়ে রেখেছে । কে আবার ! সেই লোকটাই, যাকে বাবা বলে ভাবতে পারছে না ।

ক্ষণিকের মোহে সেদিন রিমির মনটা ভিজে এসেছিল । মনে হয়েছিল, কী ভাল, কী ভাল । ওটা বোধহয় ওর লোভ । আর কিছুই নয় ।

এখন আর ওসবের প্রতি ওর কোনও আকর্ষণ নেই ।

যেভাবে আর পাঁচটা মেয়ের বিয়ের চেষ্টা হয় সেভাবেই চলছিল । কখনও কখনও কথাবার্তা ওর সামনেই হত । ও কখনও কখনও মজা পেত, কখনও কপট রাগ ।

—ছোটমামা, তুমি টাকার কথা ভেবো না । কল্যাণী বলেছে, যা কিছু এতদিন জমিয়েছি, সবই তো রিমির জন্যে । তারপর আমি তো একা মানুষ, মা আর কদ্দিন, চলে যাবে আমাদের ।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, কারও কাছে দয়ার ভিক্ষে যেন না করতে হয় ।

ছোটমামা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তুই অত ভাবিস কেন, রিমিকে যে দেখবে সেই পছন্দ করবে । ওর মতো ভাল মেয়ে ক'টা আছে !

সত্যি সত্যি একজনের পছন্দ হয়ে গেল, আর রিমিরও তাকে ।

তবু রিমি বলে উঠল, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে ।

কি কথা ? ছোটমামার চোখ কপালে উঠল । কল্যাণীর ভুরু কুঁচকে গেল । তা হলে ছেলেটিকে রিমির পছন্দ হয়নি নাকি ? না, অন্য কারও সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হয়েছে ।

রিমি বললে, একান্তে আপনাকে কিছু বলতে চাই ।

যাঁরা ছেলেটির সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা উঠে গেলেন ।

—ছোটমামা, চলে এসো । কল্যাণী বললে ।

কল্যাণী নিজেও সরে এল ।

রিমি বললে, একটা কথা বোধহয় এরা সবাই গোপন করে গেছে ।

--কি কথা ? ছেলেটি উৎসুক হয়ে জানতে চাইল ।

রিমি বললে, আমার যখন দু'বছর বয়েস, আমার মা বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল, আসতে বাধ্য হয়েছিল ।

ছেলেটি শব্দ করে হেসে উঠল । বললে, সবই জানি । ওঁরা আমাদের সবই বলেছেন । তোমার মা নিজে ।

রিমি অবাক হয়ে গেল । সব জেনেও এই ছেলেটি ওকে বিয়ে করতে চাইছে !

তা হলে ওর সর্বাঙ্গে কোনও অদৃশ্য কালিমা জড়িয়ে নেই ! কোনও স্ক্যান্ডাল নেই মা'র নামে ! কেনই বা থাকবে, থাকার তো কথা নয় ।

গভীরভাবে নিশ্বাস নিল রিমি । অযথা সারা জীবন ধরে মাথা নিচু করে এসেছে ও ! এর মধ্যে মাথা নিচু করার কিছুই ছিল না, তবু ।

ওর হঠাৎ মনে হ'ল, আমাদের তো চিরকাল মাথা উঁচু করেই চলা উচিত ছিল । মিথ্যা এতদিন লজ্জা পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি ।

বিয়ের কথাবার্তা পাকা, সবাই ব্যস্ত ।

মা, ছোটমামা, দিদা । বড়মামা এল একদিন, মামিমারা ।

ঘর ভরে উঠেছে আনন্দ-উৎসবে ।

ছোটমামা কল্যাণীকে বললে, এবার সুবিমলকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দিয়ে দে । ও আসুক, ওকে বলি । বললেই রাজি হবে ।

—কি রাজি হবে, মা ? মা'র দিকে ফিরে ও প্রশ্ন করল ।

ছোটমামা বললে, বিয়ের সময় তোর বাবা তোকে সম্প্রদান করবে । সবাই বলবে, বাবা নিজে সম্প্রদান করছে । তা হলে বেশ ভাল দেখায় ।

তক্তপোশটার ওপর বসে ছিল রিমি । ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ।

চোখেমুখে যেন ক্রোধ উপচে পড়ছে ।

বললে, কি বলছ তোমরা !

বললে, না, কখনওই না । ওই লোকটাকে আমি 'বাবা' বলে ভাবতেও পারছি না । সে কেন আমাকে সম্প্রদান করবে !

শুধু কিছু টাকা আর গয়নার লোভ দেখিয়ে লোকটা বাবা হতে চায় ?

রাগের স্বরে বললে, না মা, না । আমি তোমার মেয়ে । আমার বাবা নেই । কোনওদিন ছিলও না ।

মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি সম্প্রদান করবে, তুমি ।

কল্যাণী ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল ।

চোখে জল এসে গেল কল্যাণীর । গভীর আবেশে ওকে জড়িয়ে ধরল । কান্নার গলায় বললে, তুই তো আমারই মেয়ে । চিরকাল ছিলি, চিরকাল থাকবি ।

রিমি তখন ভাবছে, বাবার কথা শুনেই কেন এত কঠোর হয়ে উঠল

ও । শুধুই বাবাকে অস্বীকার করার জন্য, নাকি যে কথা আজ সবাই ভুলে গেছে, সেটা আবার মনে পড়াতে চায় না বলে ।

রিমি বললে, মা, আমরা তো এখন মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছি, বাবা ফিরে এলে আবার মাথা নিচু হয়ে যাবে ।

পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি

ভূমিকা

যে বয়েসে বিনিপয়সার পৈতৃক হোটেলে আহার এবং নিদ্রার সুব্যবস্থা থাকলেও মাত্র পাঁচটি কি দশটি টাকা হাতে পেলে নিজেকে আবু হোসেন মনে করা যেত, সেই চপল যৌবনে বিশুদ্ধ সাহিত্যচিন্তা ছেড়ে অর্থলোভে এই চটুল রচনাগুলি লেখা হয়েছিল। কোনও কোনওটি 'দেশ' পত্রিকায়, কয়েকটি তরল পত্রপত্রিকায়। কারণ তৎকালে সম্পাদকদের কাছে রম্যরচনার বড় আদর ছিল। প্রকাশকদের কাছে অবশ্য আদরণীয় ছিল 'একটানা রচনার', যে-কারণে পৃথক পৃথক রচনাকে প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে চাতুর্য সহকারে জুড়ে দিতে হয়েছিল। 'পত্রনবীশ' ছদ্মনামে প্রকাশ হয়েছিল বলেই বইটির নাম রাখা হয়েছিল 'পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি', যদিও বহু পাঠকের কাছে মন্তব্যগুলি অশুভদৃষ্টি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। প্রথম যৌবনের এ বই দীর্ঘকাল ছাপতে দিইনি, বয়স্ক গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হবে মনে করে।

এক মলাটে উপন্যাসের সঙ্গে এটিকে জুড়ে দেওয়া হ'ল। পাঠকরা যেন এটিকে ফাউ হিসেবে বিবেচনা করেন। অনেকের অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না বলেই এটি পুনর্মুদ্রণ করা হ'ল, কারণ তাঁদের ধারণা, রচনার চটুলতার পাশে পাশে এমন কিছু কিছু তথ্যও আছে যা লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

এতকাল সাহিত্যিকরা ভেবে এসেছেন, 'কি লিখব' অথবা 'কেমন করে লিখব'। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের সিংহচর্মে আবৃত হয়ে আরেকদল আসরে নেমেছেন, যাঁদের হাতেখড়ির প্রথম প্রশ্নই হ'ল : কেন লিখব ? প্রশ্নটা সাহিত্যের, কিন্তু উত্তরটা নয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি উত্তরটা তাঁদের : লিখব শুধু আত্মপ্রচারের জন্যে। আমি এ দলের। সাহিত্য বা সাহিত্যের বাজারকে টিকিয়ে রাখার ভার নিজের ঘাড়ে টেনে এনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করার ইচ্ছে আমারও। কিন্তু জীবনে অসংখ্য প্রেমের চিঠি, বাজারের হিসেব, লেজারের খাতা লিখে নিব ভোঁতা করা কলমটা হাতে নিয়ে বাংলা ভাষায় জীবনের প্রথম অপ্রয়োজনীয় লেখা লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটা সেলাম জানিয়ে সামনে দাঁড়াল, তার মূল বক্তব্য শুনলাম, কি নামে লিখছ ?

ভাবলাম, কথাটা ভাববার মতোই। কি নামে লিখব ? 'কি লিখব' এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতই ইলেকশন-জয়ী সদস্যের প্রতিশ্রুতির মতো উবে গেল। লক্ষ্য বিষয়বস্তু থেকে ব্যক্তিতে গিয়ে পৌঁছল। ভাবলাম, অসকার ওয়াইল্ডের 'অল আর্ট ইজ ইউসলেস' মন্তব্যটাকে যখন অনেকেই উল্টে নিয়ে ইউসলেস সব কিছুকেই আর্ট বলে জাহির করছেন শুধুমাত্র আত্মপ্রচারের বলে, তখন আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত হবু সাহিত্যিকই বা মহাজন-খুরাঙ্ক অনুসরণ করে কেন না রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি !

এই বিখ্যাত হয়ে ওঠার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হ'ল ছদ্মনাম গ্রহণ করা। নামী হওয়ার চেয়ে বেনামী হওয়ায় একটা বিশেষ লাভ আছে, বেনামী সম্পত্তির মালিকের মতো ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারা। সাহিত্যের ট্যাক্সো নিষ্ঠা আর পরিশ্রম, কিন্তু শ্রাদ্ধে মূল্য ধরে দেওয়ার মতো ফাঁকির পিছন-দরজা হ'ল ছদ্মনাম।

নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ভান করে এত বেশি করে প্রকাশ করার জন্যে আস্তিনে লুকিয়ে রাখা একমাত্র টেক্কা এই ছদ্মনাম।

কে কবে প্রথম নিজেকে বেনামী করেছিল, তা জানি নে। সম্ভবত ছদ্মনামের জন্ম হয়েছিল মুখোশ থেকে। 'ওয়ান্স আপন এ টাইম' দিয়ে শুরু করা এবং ইসপের নামে চালিয়ে আসা গল্পের গর্দভ আগে সিংহচর্ম

পরেছিল, না দাঁড়াকাক আগে ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু মানুষ যে ডাকাতি বা রাহাজানির জন্যে অথবা অপরকে ভয় দেখাবার জন্যে প্রথম মুখোশ আবিষ্কার করে, ও তেমনই চুরি জোচ্চুরির দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যে নাম ভাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, সে সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই ।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ছদ্মনামের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার একটা বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে । অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয় । হারুন অল রসিদের মতো মহত্ত্ব লুকিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলাফেরার জন্যেও ছদ্মনাম অনেকে নিয়েছেন । শেষোক্ত যুক্তিটা খুঁজে বের করতে হ'ল নিজেকে এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজনকে বাঁচবার জন্যে । যাঁরা মহৎ তাঁদের কাছে ছদ্মনাম ত্যাগের সামিল, অন্তত একদিনের জন্যেও বাদশাহি তক্ত ছাড়তে হয় তাঁদের । কিন্তু যাঁরা সাধারণ, তাঁরা মোটা অঙ্কের ডিভিডেণ্ড ভোগ করেন এরই কল্যাণে । বিশেষ করে সাহিত্যযশপ্রার্থীরা । অজানাকে জানবার যে দুরন্ত মোহ, তাকে এত নিপুণভাবে এক্সপ্লয়েট করা অমুকচন্দ্র অমুকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, কিন্তু দুটি উল্টোনো যতিচিহ্নের মাঝখানে 'অমুক'-এর পক্ষে স্বভাবজ । ছদ্মনাম সম্পর্কে পাঠককুলের স্বভাবিক ঔৎসুক্য আছে, আর ঔৎসুক্য জাগাতে পারাই লেখকের পক্ষে থ্রি-কোয়ার্টার সাফল্য ।

ছদ্মনামের আড়ালে লেখক অতি উচ্চ বেতনভোগী কোভেটেড পদাধিকারী হতে পারেন, আবার বস্তিবাসী বাসনওয়ালি মুন্নুর মা'র দোসরও হতে পারেন । তিনি একরাশ চিঠিকে গল্প আর গল্পকে চিঠি বানাতে পারেন । উড়োজাহাজ বা জাহাজ ডুবিতে নিহত হতে পারেন, আবার পরীক্ষায় ফেল করতে করতে পাস করে গিয়েও বিদেশি পত্রিকার রচনা অপহরণ করে আস্ত একটি বিদ্যাদিগ্‌গজও প্রমাণিত হতে পারেন । ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

ছদ্মনামের প্রধান দুটি গুণ অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ । এক, উত্তমপুরুষে বন্ধুর বোনকে নিয়ে বানানো প্রেম-কাহিনী লিখে হাসপাতালে না যেতে হওয়া (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে), এবং দুই, ছোট বড় মাঝারি সব দলের মানুষের গায়ে কাদা ছোঁড়া ।

এইসব বিভিন্ন যুক্তির বলেই সাধারণত অসাহিত্যিকরা ছদ্মনাম নিয়ে থাকেন, কিন্তু আমি ছদ্মনামের অনুরাগী এই কারণে যে, সত্যিকার সাহিত্যিক ও কবিদেরও ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে দেখেছি ।

উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথ ।

সব বিষয়েই যেমন রবীন্দ্রনাথ অন্যদের চেয়ে এক হাত উঁচুতে ছিলেন,

ছদ্মনামের ব্যাপারেও তেমনই। কত বিভিন্ন নামে যে তিনি লিখেছেন, কখনও খেয়াল-খুশির জন্যে, কখনও বা উদ্দেশ্য ছিল বলে, তার ইয়ত্তা নেই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'মুদ্রিতবরণা', 'বীণা অভিলাষ' এবং ভারতীতে 'দুদিন' লিখেছিলেন তিনি দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য নামে। এ ছাড়া অকপটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াসী নাম দুটিও তিনি ব্যবহার করেছেন। আর বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি। সেদিন পুরনো পত্রিকা ভাণ্ডারের জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যায় 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'র 'জলকষ্ট' এবং পরের সংখ্যাতেই জবাবে 'শ্রীমতী মধ্যমা'র 'অহেতুক জলকষ্ট' পড়ে মনে হ'ল, এ দুটিও রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম : ভানুসিংহ।

ভ্যালেটের কাছে যে হিরো হওয়া যায় না, তা সাহিত্যিক মাত্রেই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং আপিসের সহযোগী সকলের কাছেই পরিচিত সাহিত্যিক টাকা খরচ করে লেখা ছাপান, কিংবা সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সূত্রে। আর অপরিচিত সাহিত্যিক মাত্রেই শুধুমাত্র বই বিক্রি করে বালিতে বা বালিগঞ্জে বাড়ি তোলেন। কমবয়েসী রবীন্দ্রনাথ এই অভিমানেই পদাবলী ধরনের কয়েকটি গান লিখে ভানুসিংহ নামের কোনও কাল্পনিক কবির প্রাচীন রচনা বলে চালিয়েছিলেন, প্রশংসা পাবার আশায়। এই ভানুসিংহকে প্রাচীন মৈথিলি কবি মনে করে যে বাঙালি ভদ্রলোকটি জার্মানির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন তাঁর নাম নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। যদিও পরবর্তীকালে গল্পটি ভিত্তিহীন বলে সংশোধিত!

সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার কথা জানতে পারার পর থেকে জার্মানির ডক্টরেট উপাধির উপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। শুনেছি ফ্রান্সেও নাকি এক ধরনের 'ডক্টরেট' দেওয়া হয়, যাকে ক্রসওয়ার্ডের ভাষায় বলে কনসোলেশন প্রাইজ। এঁরা ফ্রান্সে নামের আগে ডক্টর লিখতে পান না, কিন্তু অন্য দেশে উপাধির যথেচ্ছ ব্যবহার চালাতে পারেন। ঘরে বসে ডাকযোগে টাকা পাঠিয়ে মার্কিন ডিগ্রি পাওয়ার চেয়েও অবশ্য এটা একটু উঁচুদরের। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত শুনেছি এই ধরনের 'ডক্টর'।

কিন্তু বৈদেশিক ছাপ যার নামের আগে বা পরে নেই (ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যাকে বানরের ল্যাজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন) তার পক্ষে ছদ্মনাম গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ যেন সামনে ফুটলাইট দিয়ে পিছনের অন্ধকারে পর্দা টাঙানো। নিজে লিলিপুট হলেও ছায়াটা ব্রবডিঙনাগের মতো দেখাবে।

এবম্বিধ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে আমি কলম-নামের পক্ষপাতী হয়েছি। কিন্তু ভাল ছদ্মনাম নির্বাচন করা যে কত দুরূহ কাজ, তা ভুক্তভোগীদের মতো আমাকেও জানতে হয়েছে।

ছদ্মনাম সংগ্রহের একটি সহজতম উপায় সকলের উপকারার্থে জানিয়ে দেওয়াই বিধেয়। অতএব আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই জানিয়ে দিই। আমি প্রথমেই একটি মোটা-সোটা অভিধান নিয়ে বসেছিলাম। তার পরে তুরীয় ভাবগ্রস্ত সন্ন্যাসীর মতো দু'চোখ বুজে হঠাৎ মাঝখানের একটি পাতা খুললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতাও। তারপর বাম ও দক্ষিণের পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি শব্দ দেখে গেলাম। থাম, থুৎনি, থুৎকার, দংশ, দক্ষ, দক্ষজা, দক্ষসাবর্ণি, দগ্ধশলাকা ইত্যাদি শব্দগুলি পেলাম। মনে হল, এর মধ্যে যে-কোনও শব্দই দগ্ধশলাকা হয়ে দেখা দিতে পারে। অতএব পুনরায় অভিধান বন্ধ করা, পুনরায় তুরীয় ভাব, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার প্রথম শব্দ পেলাম 'রাজনামা'। ইউরেকা বলার আগেই অর্থটুকুও চোখে পড়ল— পটোল। এর পরই যে-শব্দটি পাওয়া গেল, তা হল 'রাজযক্ষ্মা'। অতএব পুনরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবে ট্রাই, ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই করে গেলে ফললাভ অবশ্যই হবে। যদিচ বিখ্যাত ছদ্মনামীরা এ-পথ অবলম্বন করেননি।

উদাহরণ : পরশুরাম।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই ছদ্মনামটি কিন্তু তাঁর 'চলন্তিকা' থেকে সংগ্রহ করেননি। শুনেছি জীবনের প্রথম ব্যঙ্গ-গল্পটি লিখে তিনিও আমার মতোই ছদ্মনামের চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন এবং এ-বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে নির্বাচিত প্রায় সব নামই খারিজ করে ফেলেছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকল তাঁদের পরিবারের স্যাকরা—পরশুরাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই নামটাই বসিয়ে দিলেন তিনি গল্পের শেষে। অথচ তিনি যখন বিখ্যাত হলেন, তখন সমালোচক ও গবেষকরা কত কী অর্থ বের করলেন এই ছদ্মনামের। তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে পরশুরামের কুঠারের সঙ্গে তুলনা করা হল। এই ঘটনার পরও কি সমালোচক ও গবেষকদের উপর শ্রদ্ধা রাখতে বলেন? সে যাক, এই সূত্রে একটা খবর কিন্তু জানিয়ে রাখা দরকার যে, শরৎচন্দ্র তার আগেই 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'বেণু' কাগজে 'নূতন প্রোগ্রাম' প্রবন্ধটি এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন তিনি।

বাস্তব ঘটনা ছাড়াও অনেক সময় ছদ্মনাম নির্বাচনে স্বপ্নেরও সাহায্য পাওয়া যায়।

উদাহরণ : মার্ক টোয়েন।

স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন নাবিক। সমুদ্র আর জাহাজই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তারপর নানা বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসে এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল তাঁকে যে, বিষয়টি নিয়ে রাত জেগে একটি কৌতুককর গল্প লিখে ফেললেন তিনি—'দি জাম্পিং ফ্রগ'। কিন্তু কি নামে পাঠাবেন গল্পটা—ভাবতে-ভাবতে একসময় টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর স্বপ্নে দেখলেন, বিগত নাবিক-জীবনের একটি দৃশ্য। দেখলেন, তিনি নাবিক বন্ধুদের সঙ্গে জাহাজ থেকে দড়ি ফেলে জলের গভীরতা মাপছেন, আর গাইছেন একটি বহু-প্রচলিত গান—'বাই দি মার্ক ওয়ান ; বাই দি মার্ক টোয়েন : মার্ক টোয়েন—অর্থ দ্বিতীয় চিহ্ন। ছদ্মনাম হিসেবে এর কোনও অর্থ আছে কি নেই ভেবে দেখলেন না ক্লিমেন্স, ঘুম থেকে উঠেই ব্যঙ্গ-রচনাটির নীচে এই নামটাই বসিয়ে দিলেন। আর এই নামেই তিনি আজও বিখ্যাত।

বাস্তব জীবন হল প্রথম পৃথিবী, স্বপ্নকে বলা চলে দ্বিতীয় পৃথিবী। আর তৃতীয় পৃথিবী—জেলখানা। অনেকেই এই তৃতীয় পৃথিবীতে গিয়ে সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। কিন্তু জেলখানায় যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা—'জরাসন্ধে'র কথা বাদ দিলে—সাহিত্যের কোনও উপকার কোনওদিন করেছেন বলে শুনিনি। অবশ্য সাহিত্যিককে ছদ্মনাম জোগানোও যদি সাহিত্যকর্ম হয়, তাহলে একজন পাহারাদারকে অন্তত সাহিত্যসেবক উপাধি দেওয়া চলে।

উদাহরণ : ও হেনরি

সিডনি পোর্টার কাজ করতেন একটি ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের হিসেব মেলাতে গিয়ে অ্যাকাউন্টেন্টের নজরে পড়ল, বেশ কিছু টাকা তছনছ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিলেন তিনি, আর খবর শুনে সিডনি পোর্টার পালালেন টেকসাস ছেড়ে। পরে তিনি অবশ্য ধরা দিলেন এবং যথাকালে কারাদণ্ড ভোগ করতে হল তাঁকে। অনেকের ধারণা, পোর্টারের নিজের কোনও অপরাধ ছিল না, শুধুই ভয় পেয়ে পালিয়েছিলেন তিনি এবং সে জন্যে বিচারকরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। সে যাই হোক, জেলে থাকতে থাকতে গল্প লেখার সাধ জাগল তাঁর। কিন্তু নিজের কলঙ্কিত নামে গল্প ছাপলে কেউ পড়বে না ভেবে ছদ্মনাম খুঁজলেন তিনি। জেলখানায় তাঁর প্রহরী ছিল ও হেনরি। তারই নাম ব্যবহার করে গল্প লেখক হিসেবে বিখ্যাত হলেন তিনি।

এ ঘটনার অবশ্য মতান্তরও আছে। অনেকে বলেন, টেকসাস থেকে পুলিশের ভয়ে নিউ অর্লিনসে পালিয়ে আসেন পোর্টার এবং সেখানেই

তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত । কিন্তু স্বনামে পাঠালে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন এই ভয়ে একদিন একটি মদের দোকানে বসে জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, আর মাঝে মাঝে 'বয়' হেনরিকে ডাক দিচ্ছিলেন, ও হেনরি, আর এক বোতল ! সঙ্গী বললেন, এই তো চমৎকার ছদ্মনাম—ও হেনরি ।

ছদ্মনাম যে সব সময়ে লেখক নিজেই নির্বাচন করেন তা নয় । অনেক সময় এটি অপরের দ্বারা আরোপিত হয়, কখনও প্রশংসার ছলে, কখনও বিদ্রূপের ছলে ।

উদাহরণ : জর্জ ইলিয়ট

মেরি অ্যান ইভানস্ নামের মেয়েটি নাকি যৌবনেও কোনও পুরুষের চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারেনি । ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি যে, মেরি নিজে সুন্দর না হলেও কোনও একজনকে তার সুন্দর মনে হয়েছিল এবং তার হাবেভাবে কথাবার্তায় সকলেই বুঝতে পারত যে, এই মেয়েটি ওই বিশেষ যুবকটিকে মন দিয়ে ফেলেছে । এতৎসত্ত্বেও কেন সে মেরিকে বিয়ে করতে চায় না, প্রশ্ন করায় যুবকটি তার বন্ধুকে বলে, 'ভালবাসা পাওয়াই তো সব নয়, চেহারা ভাল না হলে কি কোনও মেয়েকে ভালবাসা যায় ? মেরি যে দেখতে একেবারে জর্জের মতো, মিঃ ইলিয়টের ছেলে জর্জের মতো কুৎসিত ।'

তারপর কি করে যেন মেরি ইভানসের কানে গেল কথাটা ; এবং এ-আঘাত সে সারা জীবনেও ভুলতে পারল না । তাই সারা জীবন এই জর্জ ইলিয়ট নামে লিখে গেল অসংখ্য উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ । যে-যুবকটি ইভান্সকে আঘাত দিয়েছিল, অনেকে সন্দেহ করেন, তিনিই হার্বার্ট স্পেন্সার । ঠিক এই ধরনের মন্তব্যই লিখে রেখে গেছেন তিনি । পরবর্তী জীবনে অবশ্য সমালোচক জর্জ হেনরি লিউইস বিয়ে করেছিলেন মেরি ইভানসকে এবং লিউইসের মৃত্যুর দু' বছর পরেই—মেরির বয়স তখন ষাট—জনৈক মিস্টার ক্রসকে বিয়ে করেন মেরি ইভান্স ।

অপরের দ্বারা আরোপিত আরও একটি ছদ্মনাম আছে ।

উদাহরণ Q

ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই ছেলেটি একটু প্রিকশাস হয়ে উঠেছিল । শিক্ষকদের বিব্রত করতে তার মতো ওস্তাদ আর একজনও ছিল না । দু' মিনিট অন্তর তিড়িং করে বেঞ্চি থেকে দাঁড়িয়ে উঠবে, আর এমন এক একটা প্রশ্ন করে বসবে যে, শিক্ষকমশাই ঘেমে অস্থির সঠিক উত্তর দিতে গিয়ে । ছেলেটি বুদ্ধিমান, পড়ুয়া হিসেবে ভাল, কিন্তু প্রশ্নগুলো বড় বেয়াড়া ধরনের । তাই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তার নাম

দিলেন 'Q' অর্থাৎ কোয়েশ্চেন-এর সংক্ষিপ্ত চিহ্ন । পরে ছেলেটি যখন সমালোচনা লিখতে শুরু করল, তখন সে 'Q' নামটি ত্যাগ করল না । বহুকাল পরে তবে পাঠকরা জানতে পেরেছিল যে, তাঁর আদি নাম স্যার আর্থার কুইলার কাউচ ।

এর আগে যে-ক'টি ছদ্মনামের গোপন তথ্য পরিবেশন করেছি, তা হয়তো আমার মতোই পাঠকরাও অন্য কোথাও-না-কোথাও পড়েছেন । সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্র কি করে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' হয়েছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচা', বঙ্গবাসীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ', প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল', শরৎচন্দ্র কেনই বা 'অনিলা দেবী', 'পরশুরাম' এবং 'অনুপমা' হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'নবকুমার কবিরত্ন' এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 'দিবাকর শর্ম্মা, সে-গবেষণা না করলেও চলবে । যাঁরা আগের কাহিনীগুলো জানতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এগুলির ইতিহাসও জানেন ।

ছদ্মনামী হলেই যে লেখক পাঠকের ঔৎসুক্য অর্জন করেন, তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু বিখ্যাত হন তাঁরাই, যাঁদের ছদ্মনামের পিছনে কোনও ঘটনা আছে । দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, আমার ক্ষেত্রে ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত অভিধান যেমন সাহায্য করতে রাজি হল না, তেমনই কোনও অভাবনীয় ঘটনাও রুপোর রেকাবিতে পানের খিলির বদলে একটি ছদ্মনাম তুলে ধরল না । সোয়াবিয়ার জাদুকর ফাউস্টও শয়তানের চর মেফিস্টোফিলসের সঙ্গে করমর্দন করেছিল, কিন্তু ভাগ্য আমার সঙ্গে দেখছি রাজি নয় ।

না, এবম্বিধ অবস্থায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল । রচনাটি প্রায় শেষ করে এনে যখন ভাবছি, কি নামে সম্পাদকের দরবারে পাঠানো যায়, সেই মুহূর্তে সত্যিই একটি ঘটনা ঘটে গেল । কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি দৈনিকের লালরঙা নাম-প্লেট ঝোলানো সাইকেলের পিয়ন এসে কলিং বেল টিপলে । বালক ভৃত্যটি ছুটে গেল, নিয়ে এল একখানা চিঠি । এযাবৎ একটিও বাংলা রচনা না লিখে যে বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিকটিতে শুধুই বেনিয়া ব্রিটিশের মাতৃভাষায় চটকদার প্রবন্ধ লিখে এসেছি, সেই পত্রিকার সম্পাদক কশ্চিৎ পাঠিকার লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন । পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাদের প্রশংসাপত্রে আমার অরুচি ধরে গিয়েছে, প্রথম-প্রথম খুশি হয়ে উত্তর দিতাম, তারপর শুধুই খুশি হতাম—উত্তর দিতাম না, বর্তমানে খুশি হই, কিন্তু পড়ে দেখি না । তা সত্ত্বেও এ চিঠিখানি আমি পড়তে বাধ্য হলাম, কারণ চিঠিটা ছোট, ঠিক হ্যাণ্ড গ্রেনেডের মতো । বিস্ফোরণও তাই বেশি । পাঠিকা লিখেছেন, 'আপনার ইংরেজি প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়েছি এই ভেবে যে, আপনি

বাংলায় লেখেন না। এরপর আপনি যদি ইংরেজিতেও না লিখে বোর্নিও বা আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখেন, তা হলে আরও খুশি হব। ও দুটি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায় আপনার লেখার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে না। খুশি হবার কথা নয় কি?'

নীচে নাম সই। পদবী পত্রনবীশ।

চট্ করে পদবীটি কুড়িয়ে নিলাম। 'পত্রনবীশ'—চমৎকার ছদ্মনাম। 'পত্রনবীশের চিঠিপত্র' নাম দিয়ে বেশ একখানা রম্যরচনার বই লেখা যাবে, আর ভূমিকাটা একটু সত্যিমিথ্যে জড়িয়ে লিখলেই বেলে লেটার্স বা জুর্নাল বলে চালাতে এতটুকু অসুবিধে হবে না। ফরাসি নামে পাঠকরা আজকাল একটু মজে বেশি। ভাবলাম, কে জানে, আজকের এই ছদ্মনামধারী 'পত্রনবীশ' অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাহিত্যারণ্যে হয়তো কোনও বনস্পতিবিশেষ হয়ে উঠবে। বনস্পতি শব্দ মারফত আমি অবশ্য ঘৃতের ছদ্মবেশে স্বনামপ্রসিদ্ধ সামগ্রীটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। বর্তমান দিনের সব রম্যরচনাই সেই বস্তু কিনা!

২

মন বলল, ভায়া হে, ইংরেজিতে বলে—ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান । অর্ধেক রাজত্ব যদি জয় করলে তো রাজকন্যে রইল কেন বাকি ?

বললাম, কথাটা ঠিক । ছদ্মনাম খুঁজে পেয়েছি, আর সেই গুণেই যুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে জিত হয়েছে এ অধম লেখকের । লেখাটা পড়ার আগেই নয়, পড়ার পরও 'পত্রনবীশ' লোকটা কে জানতে চাইবেন অনেকেই । এমনকি তারিফও করে ফেলবেন কেউ কেউ । প্রকাশকের উদ্দেশে এক তাড়া চিঠি, ডজন-দুই টেলিফোন, জন-পাঁচেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৌখিক উৎসাহ নিশ্চয়ই এসে পৌঁছুবে । আর কেউ কেউ হয়তো অনুরোধ করবেন, আরও লিখুন, হবে আপনার । অর্থাৎ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ! গাছে ওঠার পর কাঁদতে হবে কি না ঠাহর হচ্ছে না ঠিক ঠিক !

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এ কি অবস্থা ? তরোয়াল উঁচিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যে দুর্গটাকে আক্রমণ করলাম, সে যে দেখি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অহিংস আশ্রম । তরুণীটির দিকে ভয়ে ভয়ে কোথায় আড়চোখে তাকালাম, আর উনি কিনা হুমড়ি খেয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ।

যাই হোক, দুয়ার যখন খোলা পেয়েছি দুর্গই বা অজেয় থাকে কেন, ভাবলেম মনে মনে । ঝড়বৃষ্টি হবে, বিদ্যুৎ চমকাবে, আর তিলোত্তমার সঙ্গে চারিচক্ষুর মিলন হবে না ? এ কেমনতর কথা !

মন বললে, তাও কি হয় ! অর্ধেক জয় তো হয়েই গেছে, বাকি অর্ধেকের জন্যে উঠে পড়ে লাগো ।

বললাম, বাকি অর্ধেক তো অর্ধেক নয়, সে যে আসেলর ডবল । জানো না সেই আদ্ধেক ঠিকঠাকের গল্প ?

একজন বন্ধু একবার ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই দিয়েছিল খবরটা ।—শুনেছিস খবর ? অমুক রাজার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে একরকম আদ্ধেক ঠিকঠাক ।

অমুক রাজার মেয়ে তখন ঐশ্বর্যে সুতরাং রূপেগুণেও সারা দেশের চাঞ্চল্য । তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোর সঙ্গে বিয়ে ? তাও আদ্ধেক ঠিকঠাক ? ব্যাপারটা কি ?

বন্ধু হেসে বললে, মানে, আমি রাজি ।

আমার সাহিত্যসাধনাও এই ধরনের হাফ ডান কি না সন্দেহ রয়েছে মনে । তাই বললাম, লিখতে হবে হে, না লিখতে পারলে ছদ্মনাম-টাম কিস্যু কাজে লাগবে না ।

শুনে মন বললে, তুমিও যেমন ! লেখাটেখা আসল নয়, আসল কথা সমালোচনা । সেদিকটা ব্যবস্থা করো, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে । এত হইচই করার মতো উঁচুদরের কবি ছিল ইংরেজদের চ্যাটার্টন ? না, ফরাসি কবি ভিয়ঁ এমন অবহেলার পাত্র ?

দস্যু কবি ভিয়ঁ ? মন ছুটে গেল বছর কয়েক আগে, যেদিন কলকাতার একটি নির্জন সরাইখানায় বসে সারাটা সন্ধ্যা মারিওনার শান্তস্বর আবৃত্তি শুনে একজন উপেক্ষিত কবিকে নতুন করে চিনেছিলাম । ভারতীয় নৃত্যের ছাত্রী মারিওনা ফ্রান্সের মেয়ে হয়েও নাট্যনাম নিয়েছিল 'পারিজাত' । নৃশংস যুদ্ধ আজ তাকে কোথায় নিয়ে গেছে জানি নে, কিন্তু তার সুশান্ত কণ্ঠস্বরে আজও ভিয়ঁর কবিতা ভেসে আসে ।

মধ্যযুগের ইওরোপীয় কাব্যধারার শেষ তারা ভিয়ঁ । কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় : দস্যু, খুনি, ঘৃণ্য অপরাধী । বহুবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তিনি, প্রতিবারেই কৌশলে মৃত্যুদণ্ড এড়িয়েছেন । তারপর কখন এবং কিভাবে যে তাঁর অন্তর্ধান ঘটল কেউ জানে না । তাঁর মৃত্যু-তারিখের মতোই সমাধিক্ষেত্রটিও অজ্ঞাত । শুধুমাত্র তাঁর প্রাচীন আঙ্গিকে লেখা কবিতাগুলি টিকে আছে আজও । সে কবিতার প্রতিটি ছত্রে বিষণ্ণ করুণ সুরের প্রবাহ । জীবনকে তিনি বিদ্রূপ করে গেছেন, পাপকে গৌরবান্বিত করেছেন, প্রেয়সীর দেওয়া ফুলের মালাকে কোমল বাহুর আলিঙ্গন ভেবেছেন, কিন্তু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছেন ফাঁসিমঞ্চের ছায়া দেখে ।

এমন একটি চরিত্রের কবি যত ভাল কবিতাই লিখুন না কেন, উপযুক্ত সম্মান যে পাবেন না সে তো জানা কথা ।

অথচ চ্যাটার্টন ?

জন্মের আগেই পিতৃহারা, বারো বছর বয়স হওয়ার আগেই হাল্কা ব্যঙ্গ-কবিতায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, মধ্যযুগীয় ভাষা নকল করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও, রবীন্দ্রনাথ যেমন কাল্পনিক ভানুসিংহের নামে মৈথিলি ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি চ্যাটার্টনও নিজের কবিতাকে প্রাচীন দিনের বিখ্যাত কবি টমাস রাওলির কবিতা বলে চালিয়েছিলেন, সেন্ট মেরি রেডক্লিফের দেরাজে পাণ্ডুলিপিগুলি পেয়েছেন জানিয়ে ওয়ালপোলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, প্রথম প্রথম ওয়ালপোলের সাহায্য পেলেও সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শেষ অবধি

বুভুক্ষু অবস্থায় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারপর, সতেরো বছর ন'মাস বয়সে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন ।

এমন করুণ এবং বিস্ময়কর জীবনের কাহিনী শুনেই সকলে ভাবলেন, বেঁচে থাকলে কি না হতেন চ্যাটার্টন ! বিখ্যাত হয়ে গেলেন রাতারাতি । কিন্তু কবিতার বিচারে নয় ।

এমন অনেক দৃষ্টান্তই আছে যা প্রমাণ করে, মুখে আমরা যতই বলি না কেন, আসলে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনকে চোখের সামনে রেখেই সমালোচনার কলম ধরি আমরা ।

ব্যক্তিগত বলতেই ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা মনে পড়ে গেল । 'আমার বইটা তুমি রিভিউ করে দিয়েছ অতএব তোমার বইটার সম্বন্ধে আমিও অনেক ভাল ভাল কথা বলব' এ জাতীয় পারস্পরিক উকুন-বাছাবাছি যেমন সাহিত্যিকদের মধ্যে চলে আসছে, তেমনি তুমি আমাকে কাদায় ফেলেছিলে, অতএব আমি তোমাকে চৌবাচ্চার জলে চুবিয়ে ছাড়ব, এমন মহৎ চিন্তাধারাও সমালোচকদের মধ্যে কম চলছে না । এর একটা রীতিমত ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই । এবং অপরাধী হিসেবে নাম করা যায়—থাক্, দিশি নাম করতে চাই না—বিদেশি নাম ওর্ডস্বার্থ ও হ্যাজলিট ।

এদেশি কয়েকটি পত্রিকায় রিভ্যুয়ার-এর কাজ আমি করেছি । মনে আছে এক সম্পাদক বই হাতে দিয়েই বলতেন, "পড়ে আপনার ইম্পার্শাল মত দেবেন । পুরো স্বাধীনতা দিলাম আপনাকে, বুঝলেন কিনা, একেবারে দফা শেষ করে দেবেন ।"

কিংবা সহাস্যে মন্তব্য করতেন, "আপনার নিজের মতটাই লিখবেন, আমি কিছু আগে থেকে বলতে চাই না । তবে বইটা অপূর্ব, এমন বই আমি দশ বছরের মধ্যে পড়িনি ।" সুতরাং আর পাঁচজনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের (আবদার বা আক্রোশ) অভিযোগ করলেও দেখানো হ'ত সমালোচক লেখকের অপরিচিত এবং বাইরের লোক ।

ওর্ডস্বার্থ এবং হ্যাজলিট দুজনেই ছিলেন নিজের নিজের লাইনে চূড়ান্ত প্রতিভা । কিন্তু একজন আর একজনকে স্বীকার করলেন না কোনওদিন । তবে দুজনেই ভদ্রসন্তান ছিলেন এই রক্ষে । ঋষি ওর্ডস্বার্থ ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে ভার্লঁ-পরিবারের পিতৃমাতৃহীন আনেত্ মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, যার ফলে ১৭৯২ সালের নভেম্বরে আবার পালিয়ে যেতে হয় ওর্ডস্বার্থকে, আনেতের কাতর আহ্বানে এবং ডিসেম্বরেই কন্যাসন্তানের হাসিহাসি মুখ দেখে বিচলিত হতে হয়, তারপর বিচলিত হয়েও বিবাহিত না হওয়া এবং ইংলণ্ডে একাই ফিরে

আসা ইত্যাদির খবর তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরে উদঘাটিত হয়েছিল । কিন্তু এ তথ্য হাতে পেলেও হ্যাজলিট নিশ্চয়ই এর সদ্ব্যবহার করতেন না, করতেন বর্তমান দিনের যে কোনও ক্লেদসন্ধানী সমালোচক ।

অবশ্য সত্যিকার সমালোচক যিনি তিনিই অজাতমিত্র । সঠিক সমালোচনা কোনও লেখকই সহ্য করতে পারেন না, এমনকী পাঠকরাও তাঁর সঙ্গে একমত হন না । তাই চার্লস ল্যাম—পদবির মতোই যিনি শান্তস্বভাব বলে বিখ্যাত ছিলেন—তিনিও হ্যাজলিটের ওপর বিরূপ হয়েছিলেন । শেলি, কিট্স, বায়রনের জীবনকে ট্র্যাজিক বলা হয়, অথচ হ্যাজলিটের মতো দুঃখময় জীবন কারও নয় । দু'বার বিয়ে করেছিলেন তিনি । প্রথম স্ত্রী বিয়ের পরই ডিভোর্স করল তাঁকে, দ্বিতীয়জন ছেড়ে চলে গেল । বন্ধু বলতে কেউই ছিল না, যার প্রশংসা করতে গেছেন সেও চটেছে তাঁর ওপর । ফলে, যে সমালোচনা আজ সমালোচনার আদর্শ, তারই অপবাদ দিয়েছেন সমসাময়িকরা, বলেছেন হ্যাজলিট ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটান সমালোচনার নামে । আর এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বর্তমান দিনের সমালোচকেরা সমালোচনা লেখেন ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়ে ।

তাই সমালোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় বন্ধুকৃত্য, আর নয় তো শত্রুশ্রাদ্ধ । ভালমন্দ বিচারের আগেই আমরা ভেবে নিই লেখকটি কে ! বন্ধু বা বন্ধুর বন্ধু, মোটা বেতনের চাকুরে, না নামকরা কাগজের সম্পাদক, খ্যাতনামা না অখ্যাতনামা ইত্যাদি নানা বিচার করে তবেই বই সম্বন্ধে মতামত ঠিক করেন সমালোচকরা । অবশ্য বাংলা দেশের শতকরা নিরানব্বইজন সমালোচকের কথাই বলছি আমি, শতকরা একশোজন বলছি না এই কারণে যে, আমি নিজেও মাঝে মাঝে সমালোচনা লিখে থাকি ।

আজকাল আরও একটি ফ্যাক্টর দেখা দিয়েছে : রাজনৈতিক মতামত । নীলরক্ত লেখকের রচনায় যতই লালত্ব থাক্ না, চরমপন্থীরা বলবেন রিঅ্যাকশনারি, লালদের রচনা যতই সাহিত্য পদবাচ্য হোক না কেন, নরমপন্থীরা বলবেন, প্রোপাগ্যান্ডা ।

সমালোচকদের সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত একটি কথা আছে—কবির লোচন নেই বলে তো করি সমালোচন । একথা আমাদের দেশের সমালোচকদের সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য । সাহিত্য-প্রচেষ্টায় যাঁরা শেষতক ব্যর্থ হন, তাঁরাই সামালোচক বা সাংবাদিক । সাংবাদিকরা সাহিত্য ছাড়া সব কিছুকেই সংবাদ মনে করেন এ কারণেই । মফঃস্বলে চিতা বাঘ শিকারের সছবি দু'কলম হেডলাইনের খবর ছাপেন তাঁরা, কিন্তু

সাহিত্যিকের নাম ছাপা হয় একমাত্র তাঁর মৃত্যু ঘটলে—তাও যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন হ'লে তবেই। হ্যাঁ, আর ছাপা হয় কোনও পুরস্কার-প্রাপ্তির পর। সমালোচকরাও ঠিক এই দলের। সমালোচক মাত্রেরই ধারণা, নেহাত গল্প উপন্যাস কবিতা লেখেন না তাই, লিখলে কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন। আর এই ধারণা থাকার ফলে তাঁদের কাছে নিরপেক্ষ সমালোচনা মানেই ছিদ্রান্বেষণ। কিন্তু সমালোচনা যাঁদের জন্যে লেখা হয়, তাঁরা সকলেই তো অচতুর নন, তাই সমালোচনা পড়েন তাঁরা পড়ার আনন্দে, কিন্তু বই কেনেন অনেক ভেবেচিন্তে।

প্রকাশকরাও আজকাল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। দেখেছেন, অধিকাংশ সমালোচনাই বিজ্ঞাপনের স্তরে নেমে গেছে; সুতরাং বিজ্ঞাপনকে সমালোচনার স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তাঁরা। অর্থাৎ, সমালোচনার ঢঙে লেখা বিজ্ঞাপনের স্তরে। গল্পের বই বিক্রি হয় না—ফলে এঁরা এমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দেন যে, পড়ে বোঝা দায় গল্প না উপন্যাস। লোকে উপন্যাস ভেবে যদি দু কপি বেশি কেনে ক্ষতি কি!

এ তো গেল ইচ্ছাকৃত অপরাধ। সমালোচকদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আরও বেশি। মলাট এবং ভূমিকা দেখেই তো সমালোচনা সারা হয়, তাই প্রায়ই দেখা যায়, গল্পের বইকে উপন্যাস হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছে। আর সমালোচনার ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের পিছনের মলাটে লেখা ধোঁয়া-ধোঁয়া পরিচয়পত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কারণ বাংলা দেশে সাধারণত সমালোচনার জন্যে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, পুরস্কার শুধু এক কপি বই। বেগার খাটুনি জেনেও সময় নষ্ট করে বইটি পড়বেন, চিন্তা করবেন এবং লিখবেন, এমন আদর্শবাদীও সংখ্যায় কম।

তাই ধরাবাঁধা বুলি দিয়ে সমালোচনা সারা হয়। প্রতিভা, স্বাক্ষর, প্রতিশ্রুতি, স্টাইল, রচনাকৌশল, সুখপাঠ্য, অভিনবত্ব, আঙ্গিক, বুদ্ধিবাদী, হৃদয়াবেগ, প্রতিষ্ঠা, আশ্চর্য, বিস্ময়, মুগ্ধ, সংযম, শিল্পীমানস, পরিবেশ, পটভূমি, বাস্তববাদ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, আবেদন, বলিষ্ঠ, আশাবাদ, জনপ্রিয়, রচনার উৎকর্ষ, মাধ্যম, লিখনচাতুর্য, সমাজচেতনা ইত্যাদি শব্দগুলি সমালোচনার প্রধান সহায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই শব্দ ব্যবহার ক'রে একই ধরনের অকুণ্ঠ প্রশংসা চালিয়ে যান সমালোচকরা। এবং যে কোনও বইয়ের প্রশংসা করার একটা বড় সুবিধে এই যে, সমালোচনা করার জন্যে মলাট উল্টে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা এবং দাম—এইটুকু টুকে নিয়েই কাজ চলে, পড়ার প্রয়োজন হয় না। প্রশংসা করা যেমন সহজ, নিন্দা করা তেমনি দুরূহ। অবশ্য

স্কুল-ছাত্রের মাথাধরা, পেট কামড়ানোর মতোই বই পড়ে ভাল-লাগা বা মন্দ-লাগার একটা মস্ত বড় সুবিধে হল যে, তা প্রমাণ করাও যায় না, প্রমাণ করতে হয়ও না। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিন্দার ডিগ্রি শুধুমাত্র তাচ্ছিল্য পর্যন্ত পৌঁছয়। তাই ভুল-ত্রুটি দেখাতে হলে কষ্ট করে বইটি না পড়ে উপায় থাকে না।

অবশ্য প্রশংসা করতে হলে বই সম্বন্ধে কিছুটা জানা থাকলে যথেষ্ট সময় বাঁচাতে পারেন সমালোচক। তাই পিছনের মলাটে অনেক প্রকাশক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক নিজেই) গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছু কিছু চুম্বক লিখে দেন, যেটির শরণ নিয়ে দু-পাঁচ ছত্র সমালোচনা লেখা খুবই সহজ হয়ে গেছে। অবশ্য কোনও কোনও পত্রিকা এতেও খুশি নয়, এবং একটি পত্রিকার খবর জানি, যেখানে বইয়ের সঙ্গে রিভিউটিও লেখককে লিখে দিয়ে আসতে হত।

আগেকার দিনে লেখকরা ভাল রিভিউ হলেই খুশি হতেন। সম্প্রতি এক নতুন রোগ দেখা দিয়েছে। এখন লেখক এবং প্রকাশক দুজনেই বলেন, রিভিউটা যেন একটু বড় হয়। তাঁদের ধারণা, যে-বই সম্পর্কে যত বেশি লেখা হবে, পাঠকরা সে-বইকে তত মূল্যবান ভাববে। ধারণাটা নেহাত মিথ্যেও নয় বোধহয়।

যাই হোক, এ তো গেল সমালোচনার ঘরোয়া খবর। কিন্তু বহু প্রকাশক আবার এই সমালোচনাকে কিভাবে কাজে লাগান দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

প্রশংসার উদ্ধৃতি তুলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ এমন কিছু নতুন নয়। বর্তমানে শুরু হয়েছে নিন্দা তুলে বিজ্ঞাপন দেওয়া। "বইটি প্রকাশক কেন যে কালি ও কাগজ নষ্ট করে প্রকাশ করেছেন বোঝা যায় না।"—এমন ধরনের লাইন তুলে বিজ্ঞাপনদাতা আরও একটি লাইন জুড়ে দেন : "আপনি পড়ে দেখুন মন্তব্যটি কতখানি হাস্যকর।" এছাড়া বইটি সম্পর্কে যদি মন্তব্য থাকে, "এরূপ যৌন অত্যাচারের কাহিনীর প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত" কিংবা "সরলমতি বালক-বালিকারা এ বই পড়িয়া বিপথগামী হইতে পারে' তা হ'লে তো সোনায় সোহাগা। স্রেফ ওই একটি লাইন তুলে বিজ্ঞাপন দিয়ে এডিশন নিঃশেষ করে ফেলবেন প্রকাশক।

কিন্তু এতখানি দুঃসাহস যে প্রকাশকদের নেই; তাঁরা এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছেন। ডট্ ডট্ দেওয়া উদ্ধৃতির কল্যাণে যে কোনও বিরূপ মন্তব্যকে তাঁরা স্বপক্ষে টেনে আনেন। একটি বই সম্পর্কে আমি একবার লিখেছিলাম :

"বইটির প্রচ্ছদপট চমৎকার। অথচ ইহার ভিতর যে ভাষা আছে তাহা বাঙালিরা বুঝিবে না। সামাজিক গল্প বলিয়া চালাইলেও ইহা যে-কোনও রোমহর্ষক কাহিনী অপেক্ষা উদ্ভট। পড়িতে পড়িতে মনে হয় পৃথিবীর সাহিত্য খুঁজিয়া ইহার তুলনা একমাত্র বটতলার কোনও কোনও পুস্তকে মিলিবে। এবং এমন লেখকও সম্ভবত পাগলা-গারদের বাহিরে মিলিবে না। ইচ্ছা হয় গুণ্ডার চরিত্রগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হইয়া লেখকের গণ্ডে চপেটার পর চপেটাঘাত করুক। যাঁহারা এই ধরনের গ্রন্থ লিখেন, লিখিবার পূর্বে তাঁহাদের সকলের পাঠ করা উচিত বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত গ্রন্থগুলি।"

দিনকয়েক পরেই বইটির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল।

অমুক পত্রিকা বলেন: "চমৎকার ভাষা...সামাজিক গল্প... রোমহর্ষক কাহিনী...পড়িতে পড়িতে মনে হয় পৃথিবীর সাহিত্য খুঁজিয়া ইহার তুলনা মিলিবে না...চরিত্রগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র...সকলের পাঠ করা উচিত...বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য।"

এই ঘটনার পর থেকেই আমি রিভিউ লেখা বন্ধ করেছি।

৩

বিজ্ঞাপনের কথা বলতে গিয়ে একটি চিঠির কথা মনে পড়ল ।

ওঁ শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা ভরসা

মহাশয়,

আমি তিন মাস যাবৎ কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে ধর্না দিয়া দেবীর নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে তিনি আগামী মাঘী পূর্ণিমায় মনুষ্যরূপ লইয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা নামে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইবেন । ঐ দিনই ধর্মপুরের পুরাতন বাজারের বটগাছটির নিম্নে তিনি যোগিনী বেশে দর্শন দিবেন এবং যে কেহ তাঁহার পূজা দিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন । দেবী ইহাও আদেশ দিয়াছেন যে, এই সুসংবাদ যাহাতে সর্বলোকে জ্ঞাত হয় তন্নিমিত্ত এই পত্রটির হুবহু নকল করিয়া সাতজন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে হইবে । যে কেহ এই পত্র পাইবেন তাঁহাকেই সাতটি পত্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তজ্জন্য দেবী তাঁহাকে অশেষ সৌভাগ্য দান করিবেন । অবিশ্বাস ও অবহেলা করিয়া কেহ এই পত্র না লিখিলে তাহার উপর শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার রোষকষায়িত নেত্রের অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং তিনি অচিরে বিপদগ্রস্ত হইবেন, এমনকি তাঁহার এবং তাঁহার প্রিয়জনদের জীবনও বিপন্ন হইতে পারে ।

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার চরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদনান্তে

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার পরম ভক্ত ও সেবাদাস

১৯৩৮ সালের কথা । আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি । এমন সময় হাতে এসে পৌঁছল ওপরের এই চিঠিখানা । ঠিক ঠিক নকল দিতে পেরেছি চিঠিটার, এমন কথা বলব না । অনেক দিনের কথা, তার ওপর আমার স্মরণশক্তিটাও রীতিমত কম । কিন্তু মূল তথ্যের নড়চড় হয়নি, এটুকু বলতে পারি । আর মনে আছে পোস্টকার্ডখানা পেয়ে নেড়েচেড়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলাম দুরু দুরু বক্ষে । স্বর্গের পোস্ট অফিসের ডাকমোহন আছে কি না খুঁজেছিলাম । আর এ-ও মনে আছে যে সেদিনই জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সাত-সাতখানা চিঠি ছেড়েছিলাম ওই চিঠিটারই অবিকল নকল করে—সাতজন বন্ধু এবং আত্মীয়ের নামে । সামনেই পরীক্ষা তখন, সেবাদাসটির স্বপ্নদর্শনে বা শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতাটির আবির্ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করার সাহস হয়নি ।

আজ বুঝতে পারছি অজ্ঞাতনামা সেই সুচতুর ইণ্ডিজেনাস প্রচারবিদটির প্ল্যান কতখানি সফল হয়েছিল ।

এমন কম খরচে এত বেশি বিজ্ঞাপন বোধহয় পৃথিবীর কোনও প্রচারবিদই আবিষ্কার করতে পারেনি । স্রেফ তিন পয়সার একটি পোস্টকার্ড—তা থেকে সাতজন—তারপর সাত-সাততে উনপঞ্চাশ এবং সাত-উনপঞ্চাশং...হয়তো উনপঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল সিদ্ধিমাতার সমাচার ।

এই যে আদিমতম বিজ্ঞাপন, এর পিছনে কিন্তু একটি জিনিসই কার্যকরী—তা হ'ল বিভীষিকা । 'অবিশ্বাস বা অবহেলা করিয়া কেহ এই পত্র না লিখিলে তাহার উপর শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার রোষকষায়িত নেত্রের অভিশাপ বর্ষিত হইবে ।' এই যে ভয় দেখিয়ে ধর্ম ফিরি করা—এর অনুকরণ কিন্তু আধুনিকতম বিজ্ঞাপনেও দেখতে পাবেন । কাগজ খুললেই দেখবেন 'বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ায় প্রতি বছর প্রায় (অনেকগুলি শূন্যের আগে এক লেখা) মানুষ মারা যায় ।' এবং তারপর ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে নিয়মিত অমুক সেবন করুন ।' কিংবা 'সকালে উঠে কি আপনার গা ম্যাজম্যাজ করে ? (যদিও শতকরা একশোজনেরই করে) তা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই রাত্রির অবসন্নতায় ভুগছেন । এ বড় মারাত্মক ব্যাধি, অতএব প্রতিদিন শোবার আগে অমুক পান করুন ।'

বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্যটা কি ? প্রচারের ইংরেজি হ'ল পাবলিসিটি, আর কে যেন সেদিন বলছিলেন পাবলিসিটি মানে পাবলিকের উদ্দেশে সিটি মারা । ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সিটি মেরে কলার উল্টে এপাশ ওপাশ দেখে নাও, কে কোথা থেকে ফিরে তাকাল । বিজ্ঞাপনও তাই । লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এর আসল উদ্দেশ্য । কিন্তু তাই কি ? বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য হ'ল মাল বিক্রি করা । অথচ সারা বছর খবরের কাগজে পত্রিকায় যদি কেউ বড় বড় বিজ্ঞাপন দেয় তা হলেই কি বিক্রি হবে সেটা ? আমাদের দেশের অনেকেই ভুলে যান যে, যে-মাল বিনা বিজ্ঞাপনেও বিক্রি হয় (অন্তত কিছু কিছু) কেবলমাত্র সেই জিনিসই বহুগুণ বেশি বিক্রি হতে পারে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে । যা বিক্রি হবার নয়, যার চাহিদা নেই, হাজার বিজ্ঞাপন দিলেও তা বাজারে কাটবে না । এই যে আপনারা গরমে হাঁসফাঁস করছেন, হা-হুতাশ করছেন এক দমকা বাতাসের জন্যে, কিন্তু আমি যদি কোনও পত্রিকার পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিই এক পয়সায় এক মুঠো বাতাস দেব বলে, আপনারা কি ছুটে আসবেন ? অথচ যদি বলি, আমার দোকানে চার আনায় তালপাতার পাখা পাবেন, তা হ'লে আপনারা যাঁরা ঠিক স্মরণ করতে পারছেন না কোথায়

তালপাতার পাখা বিক্রি হয়, তাঁরা স্মৃতির ওপর ট্যাক্সো না বসিয়ে এক আনার পাখা চার আনাতেই কিনে নিয়ে যাবেন ।

অতএব বিজ্ঞাপনদাতার প্রধান বিচার্য হ'ল তাঁর মালের চাহিদা আছে কি না বা চাহিদা হতে পারে কি না ভেবে দেখা । দ্বিতীয় কর্তব্য হল, খদ্দেরের হাতের কাছে অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় ছোটবড় সব রকমের মাল বিক্রির জন্যে মজুত রাখা । এবং তৃতীয় কাজ হ'ল বিজ্ঞাপন মারফত সাধারণকে ওয়াকিবহাল করা ।

কিন্তু যেনতেনপ্রকারেণ বিজ্ঞাপন দিলেই তো আর কাজ হবে না । তার জন্যে দুটি বিশেষ দিকে চোখ রাখতে হবে, আর একটি দিকে মন । পাঠকের মন, বোধবুদ্ধি, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা, এদিকটি সম্পর্কে পুরোদস্তুর জ্ঞান থাকা দরকার । অর্থাৎ পাঠককে আকর্ষণ করার পন্থা আবিষ্কার করতে হবে প্রথমেই এবং তার জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে ব্যবহার করতে হবে মাত্র দুটি মাধ্যম । অক্ষর আর ছবি—সাহিত্য আর শিল্প । ভিসুয়ালাইজেশন, লে-আউট ইত্যাদির কাজে তাই মনস্তত্ত্বের স্থান অনেকখানি । ভাষার দিক থেকে অবশ্য বাংলা বিজ্ঞাপনের রীতিমত একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গেছে । ঐতিহ্যই তো ? না, সংস্কৃতি বলতে হবে ? আজকাল সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য শব্দ দুটোর এত ছড়াছড়ি যে যে-কোনও প্রাচীন পাগলামিকেও আমরা সংস্কৃতির কোঠায় এনে ফেলছি । অতএব পাঁজির বিজ্ঞাপনের আদি ও অকৃত্রিম ভাষাই বা বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হবে না কেন ?

পাঁজির বিজ্ঞাপনে শুধু ভাষাই নয়, বিজ্ঞাপন মারফত যে মালগুলি ফিরি করা হয়, তাও কম আজব নয় । আজব আয়না, প্রেমের সুরমা, মুহব্বত-কী ডোরি—সব কিছুরই মূল বক্তব্য বশীকরণ । 'আপনি যাহাকে চাহেন, সে পুরুষ অথবা স্ত্রী যাহাই হউক না কেন এবং যত উদাসীন ও অবাধ্য হউক না কেন, এই কবচের গুণে সে আপনার অনুগত হইবে ।' ওপরে ডবল গ্রেট হরফে মিথ্যা প্রমাণে '১০০১ ৲ টাকা পুরস্কার' এবং নীচে কোনও এক দেবদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত শুদ্ধ বশীকরণ কবচের বিজ্ঞাপন আপনারা সকলেই দেখেছেন । এই সব কবচের আবার নানা মডেল পাওয়া যায়, কোনওটির শক্তি কম, দাম কম, কোনওটির শক্তি কয়েক ডিগ্রি বেশি, দামও তদনুপাতে এবং কতকগুলি মহাশক্তিশালী । এছাড়া আছে প্রেমের দড়ি : 'বহু কষ্টে অর্থব্যয়ে সন্ন্যাসী প্রদত্ত এই কবচ পাওয়া গিয়াছে । কাহারো সহিত ভালবাসা বা সৌহার্দ্য করিতে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি এই কবচ ধারণ করিবেন । কোনও স্ত্রীলোকের সহিত যদি কেহ বিবাহ করিতে বা তাহার সহিত ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা

হইলে এই কবচ গলায় ধারণ করিলে বিবাহ সেই কন্যার সহিত নিশ্চয় হইবে বা তিনি তাঁহার আকৃষ্ট হইবেন এবং সে নিজেই আপনার নিকট আসিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিবে ।'

আর প্রেমের সুরমা চক্ষুদ্বয়ে লাগাইয়া বাঞ্ছিতের নিকট যাইলে, যতই কঠিন তাঁহার হৃদয় হৌক না কেন তৎক্ষণাৎ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইবে । ইহা অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক ।'

আশ্চর্যজনক নিঃসন্দেহ, কারণ এই ধরনের বিজ্ঞাপনে ঠিকানাগুলি দেখবেন নাগালের বাইরে । আগে দেখা যেত এগুলির ঠিকানা অমৃতসর, আজকাল, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ইত্যাদি । আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, তাঁর দেশে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলির ঠিকানা থাকে : কালীঘাট । আট টাকায় দুটি হাতঘড়ি বা দুটাকা পনের আনায় হাজার দফা পুরস্কারের বিজ্ঞাপন বশীকরণের ধারে-কাছেও যায় না । সম্মোহিত বশীকরণ রুমাল : 'দেবদূতদ্বয়কে বশীভূত করিয়া সম্মোহন বিদ্যার দ্বারা এই রুমাল প্রস্তুত । যাহাকে আপনি পছন্দ করেন তাহাকে এই রুমাল দেখাইলেই সে বশীভূত হইবে ।' অবশ্য পরীক্ষায় পাস, পাকা চুল কাঁচা করা, দশ টাকায় আসল আমেরিকান স্বর্ণের কানপাশা, গাত্রচর্ম রঞ্জিত করার প্রণালী, চুল কোঁকড়ানোর লোশন, দুর্বল লোকের জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অমুক টনিক, যাহা সেবনে গণ্ডদেশ গোলাপী আভাযুক্ত টুকটুকে হইবে', এ সব বিজ্ঞাপনও কম যায় না । এ ছাড়া বইয়ের বিজ্ঞাপনও থাকে পাঁজিতে । তার বিষয়বস্তু : বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়, গৃহচিকিৎসা, ধর্মগ্রন্থ, বটতলীয় নাটক, জ্যোতিষ বিচারের বই এবং কোকশাস্ত্র ও প্রেমশাস্ত্র ২৯৬টি ছবি সম্বলিত—

এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এই পুস্তকের মূল রহস্য ও অপার মহিমার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব । শয়ন-কক্ষের চিত্র সম্বলিত । বিবাহিত ব্যক্তির আদর্শ পুস্তক । খুব অল্প সংখ্যক মাত্র রহিয়াছে । ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না । এই পুস্তকের সহিত তিন ফোঁটা 'হেভেনলি এনটিমনি' বিনামূল্যে দেওয়া হয় । এক ফোঁটা চোখে ফেলিয়া যাহার সামনে যাইবেন সেই (স্ত্রী বা পুরুষ) দেখিবেন ম্যাজিকের ন্যায় আপনাকে ভালবাসিতে শুরু করিবে ।

এ ছাড়া আছে : কামরত্ন বা বশীকরণ তন্ত্র, সাঁওতালি বশীকরণ তন্ত্র, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, অদ্ভুত গুপ্তবিদ্যা, গোপাল ভাঁড়, গার্হস্থ্যভাণ্ডার, সৃষ্টির মাহাত্ম্য, প্রেমের চিঠি লিখিবার পদ্ধতি, আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি । এবং এই সব বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও ছবি কত লোভনীয় ভাষায় লেখা যায় তার প্রতিযোগিতাও দেখা যায় পাঁজির পাশাপাশি পৃষ্ঠাতেই ।

পাঁজির কৃতিত্ব কি শুধুই বিজ্ঞাপনের ভাষায় ? ছবিতেই বা পাঁজি কম যায় কোথায় ? বিভার্লি নিকলসের ক্লেদসন্ধানী কলমে যা প্রকাশ পেয়েছিল তার পিছনে অসদুদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে । কিন্তু পাঁজির বিজ্ঞাপনের চেয়েও রুচিবিরুদ্ধ তার ছবি । ম্যাজিক আংটির পিছনে দেখতে পাবেন একটি পুরুষের হাতে জ্যোতিবিকিরণকারী অঙ্গুরীয় আর একটি তরুণী তাকে জড়িয়ে ধরেছে । এ ছাড়া আছে সালসার বিজ্ঞাপন : একটি পুরুষ পায়ের তলায় একটি সিংহকে চেপে রেখেছে এবং কাঁধে তুলেছে একটি হাতি । এ ছাড়া কয়েকটি ছেলে মাকে ঘিরে ধরেছে সালসা পাবার লোভে এবং 'মা' এক হাতে সালসার শিশিটি ধরে অন্য হাতে গ্লাসে করে সালসা বিতরণ করছেন । এই ছবিটি একটু পর্যবেক্ষণ করলেই অকারণ বিস্রস্ত বসনের কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হবে আপনাকে । এ ছাড়া আছে স-টাক বৃদ্ধের দেঁতো হাসি এবং অ্যামেরিকান স্বর্ণের অলঙ্কার পরিহিতা 'সুন্দরী', শিল্পীর অঙ্কনদক্ষতায় যাকে অশোক বনে সীতার আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায় রবি বর্মার বিখ্যাত ছবিটিতে । কিংবা চেড়িদেরও বোধহয় এই সুন্দরীটির তুলনায় সুন্দর মনে হয় ।

কিন্তু পাঁজির বিজ্ঞাপনের এই 'ঐতিহ্য' যেমন অপ্রতিহতভাবেই চলে আসছে তেমনি পাশাপাশি আর একটি সুন্দর এবং সুষ্ঠু ধারাও জন্মকাল থেকে ক্রমশ পরিণতির সন্ধানে ছুটে চলেছে ।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের জন্ম, অবশ্য বাংলা দেশে বোধহয় এইচ বোসের 'কুন্তলীন'র খুব আগে নয় ।

কেশে মাখ 'কুন্তলীন'
অঙ্গবাসে 'দেলখোস'
পানে খাও 'তাম্বুলীন'
ধন্য হোক এইচ বোস ।

এই ছন্দ মেলানো বিজ্ঞাপনটি বোধহয় অনেকেরই স্মরণে আছে । এ ছাড়া 'কুন্তলীন'র আরও এক বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার । লেখকদের গল্পের মধ্যে 'কুন্তলীন' নামটি দিয়ে এইচ বোস কোম্পানি যত না সফল হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি নাম কিনেছিলেন গল্পের জন্যে কুন্তলীন পুরস্কার ঘোষণা করে । শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামাই এই পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে কুন্তলীনের প্রচারে সহায়তা করে গেছেন ।

এর পরই বিজ্ঞাপন-শিল্পের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মনে পড়ে । সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন । শুধু

যেদিন ফুটল কমল
আমি কিছুই জানি নে

—এই শ্লোগানই নয়, রবীন্দ্রনাথের আরও বহু কবিতা ও গানের অংশকে বেঙ্গল কেমিক্যাল বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ছবির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সত্যিকার চারুকলার প্রবেশ ঘটল ব্যবহারিক শিল্পে। তখনকার দিনে একটি ভাল ছবি যতখানি নয়নাভিরাম মনে হত, বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনের ছবিও ততখানিই। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনের কপিতেও অর্থপূর্ণ অথচ শ্রুতিসুখকর শব্দের দেখা মিলল। এর জন্যে অব্যবহৃত সংস্কৃতজ শব্দকে ফিরিয়ে আনা হল পুনরায় এবং নতুন নতুন শব্দ চয়নের দিকেও চোখ পড়ল।

ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস, জবাকুসুম, হিমানী এবং কেশরঞ্জন—কেউই পিছিয়ে রইল না। নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি নামে একটি সাহিত্য-সঙ্কলনে গল্পের ভেতর 'হিমানী' নাম প্রচার করা হ'ত। সঙ্কলনটি প্রথম প্রথম সাহিত্যের জন্যে পুরস্কারও দিত। গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুটি গল্প মনে পড়ছে। একটি 'কেশরঞ্জন পত্রিকা'য় প্রকাশিত, অন্যটি জবাকুসুমের।

দ্বিতীয় গল্পটি : একটি মেয়ে এক শিশি জবাকুসুম আনিয়ে চুলে মাখার পর অভ্যাসবশত হাত দুটি মুখের ওপর বুলিয়ে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে গোঁফদাড়ি গজিয়ে উঠল।

প্রথম গল্পটিও তাই। এক ভদ্রলোক এক শিশি কেশরঞ্জন কিনে ট্রামে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শিশিটি ভেঙে গেল। তখন ভদ্রলোক তেলটা হাতের চেটোয় তুলে নিয়ে পায়ে ঘষলেন আর লম্বা লম্বা চুল গজিয়ে উঠল পায়ে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপনের জন্মকথা এইটুকুই।

পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময় থেকে বিজ্ঞাপন কিন্তু রীতিমত আর্টের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একটি ভাল গল্প কবিতা প্রবন্ধের মতোই ভাল বিজ্ঞাপনের আজ পঠনপ্রিয়তা আছে। বছির দিকে আজ চারুকলা ক্রমশই অবিকৃতভাবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ রেখে আজকের ব্যবহারিক শিল্পীরা যে ছবি আঁকছেন তা ফাইন আর্টের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। অন্য দিকে শ্লোগান ও কপির ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার আজ আর খুব সুদূর পার্থক্য নেই। ঘোষণার উচ্চনিনাদ অপেক্ষা আজ আকর্ষণের সূক্ষ্মতাই প্রচারবিদের দৃষ্টি বেশি করে আকর্ষণ করছে।

এ তো গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনের কথা। বইয়ের বিজ্ঞাপনেও পরিবর্তন কম হয়নি। পাঁজির পাতায় যে বইয়ের বিজ্ঞাপন শোভা পায় তার উল্লেখ আগেই করেছি।

কিন্তু পাঁজির আশেপাশে একটি রুচিসম্পন্ন ভদ্রগোছের বিজ্ঞাপনের ধারাও ছিল বাংলা ভাষায়। অতিশয়োক্তি-দোষ-বিবর্জিত, শুধুমাত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, মূল্য এবং বিশেষণবিহীন লেখকের নাম—এই ছিল তখনকার সুধীপ্রিয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন। পুরনো দিনের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ওল্টালেই এ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে।

সব বিজ্ঞাপনদাতাই অবশ্য এই স্বল্পকথনের গুণকে গুণ বলে স্বীকার করতেন না। অনেকে বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে।

তাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের বিজ্ঞাপন :

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের সাহানসা বাদশা, উপন্যাস-প্রেমিক
সমাজের হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত
গল্প-সাহিত্যের মোপাঁসা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

কিংবা

উপন্যাস-সাম্রাজ্ঞী বিশ্ববিদ্যালয়-সম্মানিতা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাময়ী সুলেখিকা অনুরূপা দেবী।

বইগুলিরও বিশেষণ আছে :

'সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম তেজোদ্দীপ্ত উপন্যাস। যাহার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর সমুপস্থিত।' 'উল্কা নহে, প্রতিভার মেরুজ্যোৎস্না।' 'প্রেমের লহরলীলা—আত্মদানের সুমেরু।' এ ছাড়া আছে 'এ যে শরমে লুকানো মরমের ব্যথা', 'স্বপনে গঠিত আত্মনিবেদনের প্রেম-মন্দির', 'শুভগ্রহ না ধুমকেতু না প্রেমের ধ্রুবতারা?' 'প্রেমের মন্দাকিনী-প্রবাহ'; এবং 'এই উপন্যাস-রত্নমুকুট যাহার ১৩ ৲ টাকার কম মূল্যে কস্মিনকালে বিক্রিত হইবার আশা ছিল না—তাহাই মাত্র ২ ৲ টাকায়'।

আরও আছে :

প্রতিভারূপিণী সুলেখিকার শ্রেষ্ঠ অবদান, যে সর্বজনসমাদৃত উপন্যাসের বৎসরে একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়, প্রত্যেক স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর বিবাহে নব-বধূকে যে প্রেমমন্দির উপন্যাস উপঢৌকন অপরিহার্য—যে উপন্যাস পাশ্চাত্ত্য প্রেম-লালসা-পঙ্কিল প্রবাহে কলুসিত নহে—অথচ সর্বত্র প্রেমের অমল ধবল জ্যোৎস্নায় পুলকিত—তাহার নূতন পরিচয় নিতান্ত অনাবশ্যক।'

প্রেমের শুকতারা, পারিজাতসম গল্পগুচ্ছ, মাতৃস্নেহের অলকানন্দা প্রবাহ, প্রেমের মেঘাড়ম্বরের ভিতর বিদ্যুৎবিকাশ, অনন্ত প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ ইত্যাদি বিশেষণ প্রত্যেকটি বইয়ের। স্বভাবতই সন্দেহ হবার কথা, বিজ্ঞাপনদাতা সাহিত্য-গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, না, প্রেম ফিরি করছেন!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিশেষণ দেখতে পাই:

সাহিত্যের সব্যসাচী, সেই সর্বজনপ্রমোদন তরুণচিত্তজয়ী ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান্ রসশিল্পী—সমালোচনা-বিদ্রূপের 'রসরাজ'।

বইগুলির বিশেষণও তথৈবচ। একটি: প্রেমর কুহেলিকা না সম্মোহনের ইন্দ্রধনু? অন্যটি: নবপ্রণয়ের কুহকমন্ত্র না আশার প্রমোদহিল্লোল? তৃতীয়টি: প্রেমের মহিমাময় দানে সমৃদ্ধ নবোন্যাস। চতুর্থ বই: তরুণসমাজের চলন্ত বায়োস্কোপ। এ ছাড়া আছে প্রলয়-ডম্বরু সম্পাদকের খেয়াল খাসা, রং তামাসা ঠাসা, ছাইকোলজির ছাগতত্ত্বের কৌতুক! ঝালদার চানাচুর ও মতিচুর, প্রেমের পূর্বরাগের সম্মোহন ছবি, রূপযৌবনের মোহন ফাঁদ, প্রজাপতির চূড়ান্ত দূতীয়ালী পর্ব! নব্য-উকিলের বাজার-বিলাস কসরতি, 'আজ ফকির কাল আমীরে'র সুকৌশল, লালসার নির্লজ্জ অভিনয়ের ছায়াছবি, রস-ছলছল প্রেম-ঢলাঢল হাসি-ঝলমল প্রমোদ উদ্যান, প্রেমের প্লাবন না করুণার বরুণা, যেমন রংদার—তেমনি রূপের ফোয়ারা।

আরও আছে: প্রেমের বসন্তলীলা, স্পিরিচুয়াল ফন্দিবাজী, নভেলী প্রেমের রঙ্গউল্লাস, জুয়ার ধুয়া, প্রহেলিকার স্বপ্ন, হাসির লাফিংগ্যাস, যৌবনরসের ফোয়ারা ইত্যাদি।

বিশ্বসাহিত্যে সুপণ্ডিত, আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তক, সৎসাহিত্যের 'বীরবল', স্বনামধন্য সমালোচক-কুলচূড়া, সুচিন্তাশীল মনীষী লেখক, প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, 'সবুজপত্রে'র সেই নির্ভীক সম্পাদক—

কে হ'তে পারেন, প্রমথ চৌধুরী ছাড়া?

বাংলার সত্যকার সাহিত্যিকদের বইয়ের বিজ্ঞাপনে বোধহয় কপি-লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেন না, তাই প্রতিভার বিকাশ সেখানে তেমন ঘটত না। সুতরাং বিশেষ ধরনের ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ এবং অজ্ঞাতনামাদের লেখা রুচিবিরুদ্ধ বই, যেগুলি পড়ে তখনকার দিনে শুধু 'তরলমতি বালকবালিকারা'ই নয়, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরাও চঞ্চল হয়ে উঠতেন—সেগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভাষায় ছিল হুরীপরিবৃত বেহেস্তপ্রাপ্তির লুব্ধতা।

দৃষ্টান্ত :

'যাবেন কি প্রেমের স্বপ্নরাজ্যে ? প্রমোদরঙ্গের এরোপ্লেনে স্ফূর্তির হাওয়ায় মজাসে উড়ুন । আদিরসের তুমুল তুফান : লহরে লহরে কেচ্ছা বেঁফাস—প্রবাহে প্রবাহে মজাদার ঢেউ ! সুন্দরী বিলাসিনী ধরিবার চাঁদ-ধরা ফাঁদ পাতা ফ্রান্সের বিলাসলীলার বায়োস্কোপ । রঙ্গিনী ধনবতী বিধবার বাছা বাছা ফরাসী বীরের সহিত রীতিমত প্রেমের ব্যবসা—সম্ভ্রমে সবই ঢাকা পড়ে ! 'লরেটি'—বাঙ্গালায় কি বলিব, বেশ্যা নয়—রঙ্গিণী বিলাসিনী—প্রেমের জোয়ারে বড় বড় নাগরের হাবুডুবু কৌতুক ! মদ্দামেয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিভ্রমণ ! ইচ্ছামত আত্মদান ;—লর্ড মজলিসে সতীত্ব-বিসর্জনের উলঙ্গ চিত্র ।'

এর পরই—'নানা'র বিজ্ঞাপন দেখুন :

'ফরাসী-সাহিত্যের প্রমোদ-মদিরা, ফরাসী-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক এমিলি (?) জোলার 'নানা' অভিনব ফরাসীচিত্র সুশোভিত । সুন্দরী কুলগরবিণী 'নানা' থিয়েটারের অভিনেত্রী—তাহার রূপের বহ্নিতে প্যারিসের ধনকুবের পঙ্গতগণ কেমন মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আত্মাহুতি প্রদান করিয়া তীব্র লালসার জ্বালা প্রশমিত করিত, দেখিয়া শিহরিয়া উঠুন । নর্তকীর গুপ্তকথা—গুপ্ত নহে ব্যক্ত । ৭০ বর্ষের ঝুনো প্রেমপাগল হইতে ১৪ বর্ষের বালক-প্রেমিক পর্যন্ত এ প্রেমরসের নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছে—প্রমোদ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে । এ প্রণয় নয়—প্রলয় ! প্রেম নয়—ল্যাম্পট্যলীলা ! কেচ্ছাকাহিনীর গুপ্ত কথা !'

এরপরও যদি আপনারা ধৈর্য না হারিয়ে থাকেন তো আরেকটা উদ্ধৃতি দিই :

'সং-এর রাজা ! ঢং-এর বাহার !!
আনন্দ মদিরার ঝালদার বুকনীর চাটনি !
বেহদ্দ মজার প্রমোদরঙ্গ
বাবু বাই ধরেছে করবে থিয়েটার ।'
'নয়া নয়া চাঁদের হাট—
নয়া সুরৎ নয়া ঠাট ।
পগার পারে ঝোপের ভিতর ছিল বিরলে
খাম্‌কা এসেছে চলে ; গরবিণী গোবরগাদায়
জুটেছে তাই মিলানো সাট ।'

কিন্তু

'মধু ফুরালে ভ্রমরা-বঁধু
ফুল পানে না চায় !

রঙ্গমঞ্চের গুপ্তসংবাদ—বিচিত্র সম্মোহনলীলা ; আমোদপ্রমোদের প্রেমতরঙ্গে ভাসুন !

রসের গুঁড়া নহে, রসের চূড়া—
চূড়ান্ত প্রেমের জ্বলন্ত কাহিনী !'

দামের ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের কসরতি কম ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কিত বইয়ের বিজ্ঞাপন :

'মোহনীয়া বাঁশরীর বিনোদিয়া বেশের সঙ্গে পাঞ্চজন্যের উদ্দীপন নিনাদ ! নূপুরের রুণুঝুনুর পর রণডঙ্কার ভৈরব-উল্লাসে সর্বশাস্ত্রসার গীতা প্রচার ! এবং শ্রীরাধামাধবের পুলকচঞ্চল লীলামাধুর্য প্রতিভাত করিবার জন্য ৫ টাকা মূল্যে বিতরিত।'

বইয়ের বিজ্ঞাপনের এই যে এতগুলি দৃষ্টান্ত দিলাম, এর একটিকেও কাল্পনিক মনে করে কৃতিত্বের জন্য লেখককে ধন্যবাদ দেবেন না দয়া করে। সন্দেহভঞ্জন করার জন্যে ১৩৪৫ সালের মাঘ সংখ্যা 'বসুমতী'র পাতা উল্টে দেখতে পারেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন কি ভাষায় দেওয়া হ'ত তার দুটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে।

নৈবেদ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপন :

শিক্ষিত নরনারীর চির আদরের সুপ্রতিষ্ঠ সুকবি অধুনা বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত—সুচারু কাব্যগ্রন্থ।

রাজসংস্করণ—গ্লেজ তাসের ন্যায় কাগজে, মুক্তার ন্যায় অক্ষরে, রেশমের ন্যায় কাগজের আভরণে এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত ; ২০০ দুইশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময়, প্রাণময়, ভাবময়, সুধাময় গ্রন্থখানি নিশ্চয় পাঠ করিবেন। সহৃদয়কে কাঁদাইতে, ভাবুককে ভাবসাগরে ভাসাইতে, তন্ময় করিয়া মরজগৎ হইতে চিরসুন্দর অমররাজ্যে বিচরণ করাইতে এই গ্রন্থ কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, কিরূপ পাঠমনোহর হইয়াছে, তাহা দেখিবার, পাঠ করিবার, শুনিবার পক্ষে এবং উপহার প্রদানে, উপহার গ্রহণে, বিবাহ-বাসরে, ফুলশয্যায়, শুভকার্যে—সর্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে, তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন, এই ফুলের হার

গলায় পরিলে সৌরভে দশদিক আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও 'নৈবেদ্য'র পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে । জীবনের অপকার্যের অবসাদ যাইবে, জীয়ন্তে স্বর্গের সুষমাপ্রাপ্ত হইবেন । কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব ; আমাদের সবিনয় অনুরোধ—একবার পাঠ করুন ।

মূল্য ১ ্টাকা স্থলে ॥ আনা মাত্র, ডাক মাশুল দুই আনা ।'

চোখের বালির বিজ্ঞাপন :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্নিময়ী লেখনীপ্রসূত বিশ্ববিমোহন নবীন সামাজিক উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ । রাজসংস্করণ পুস্তক ছাপা হইতেছে, কাগজ মসৃণ—ছাপা অতি সুন্দর, সুবর্ণমণ্ডিত বিলাতী বাঁধাই, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।

যে গ্রন্থের নাম আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে উপন্যাস কবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসী এতদিন উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, যে উপন্যাস বঙ্গের সর্বপ্রধান মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনে প্রতি মাসে এক এক অধ্যায় পাঠের আশায় পর মাসের বঙ্গদর্শনের জন্য গ্রাহকগণ ডাকঘরে ছুটাছুটি করিতেন, যে উপন্যাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে—অগ্নিময় সত্য, নিত্য সিদ্ধ—ঘটনাবলী পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে, যে উপন্যাস প্রচারিত হইয়াই বঙ্গীয় উপন্যাসজগতে একদিনেই সগৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, যে উপন্যাস প্রচারের অনতিবিলম্বেই নাট্যশালার অভিনয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শককে মোহিত করিয়াছে, যে উপন্যাস লোকচরিত্র, নারীচরিত্র সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে—সেই সামাজিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আজ গ্রাহকগণের দ্বারে উপস্থিত হইল ।

অতি শীঘ্র এ উপন্যাস পাঠ করুন । নরনারী যুবক-যুবতী, বিবাহিত অবিবাহিত, যাঁহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্যপ্রেম চাহেন, তাঁহারা 'চোখের বালি' নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন ।

রাজসংস্করণ, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ২ । টাকা চারি আনা মাত্র, এক্ষণে ২ ্দুই টাকা পাইবেন ।

যাঁহারা একত্রে দুইখানি পুস্তক—'চোখের বালি' ও 'নৈবেদ্য' লইবেন, তাঁহারা ২ ্দুই টাকায় পাইবেন । ডাকমাশুল তিন আনা ।'

বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাপনটির প্রচারক ছিলেন 'বসুমতী পুস্তক বিভাগ' । এবং এই বিজ্ঞাপনগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল, হাতের টাইপে বইটি ছাপাতে গিয়ে । 'যু' ও 'প্র' অক্ষর দুটি কম পড়ে যাওয়ায়

প্রেসকে সেগুলি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয় । অনুসন্ধান করলেই দেখবেন 'যুবক-যুবতী' এবং 'প্রেম' শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্যেই অক্ষর দুটি কম পড়েছিল ।

কিন্তু ভাষায় সে-যুগের বিজ্ঞাপনে যতই কারসাজি থাক্ না কেন, এ-যুগের কোনও কোনও বিজ্ঞাপনদাতার চাতুর্যের কাছে তাও হার মানে । অর্থাৎ ভাষা এবং ছবিই নয়, স্রেফ প্রবন্ধের আকারে লেখকের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেন অনেকে, অবশ্য তার জন্যে টাকাও কম দিতে হয় না । কিন্তু অন্যান্য প্রবন্ধের মাঝখানে সে বিজ্ঞাপন এমনভাবে বিরাজ করে যে অসচেতন পাঠকরা অনেক সময় লক্ষ করেন না যে সে প্রবন্ধের শেষে কোথাও এক জায়গায় 'বিজ্ঞাপন' বা Advt. আছে । শেষোক্ত শব্দটি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে Ad বা A হয়েছে । কোনও কোনও বিজ্ঞাপন আবার একেবারে সংবাদের ছদ্মবেশে পরিবেশিত হয় ।

সেই জন্যেই অনেকে এ-যুগকে বলেন বিজ্ঞাপনের যুগ । কিন্তু এমন কি জিনিস আছে যা বিনা বিজ্ঞাপনেই বিক্রি হয় ? বলতে পারেন ?

৪

পান !

অথচ পৃথিবীতে পান না থাকলে কি ক্ষতি হত ? মানুষ কি বদ্‌লে যেত একটুও ? শিবরামবাবুর পক্ষে ভূরি ভূরি রচনা লেখা সম্ভবত হ'ত না—এই যা । কিন্তু তাতে তাঁর লাভই হ'ত । 'দেবতার জন্মে'র মতো গল্প বা 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'র মতো প্রবন্ধ বা 'ছবি আঁকার হাতে খড়ি'র মতো রসালো রচনার লেখক হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই কম মর্যাদা পেতেন না । পান না থাকলে হয়তো স্যাকরাদেরও ব্যবসা গোটাতে হত । শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' চরিত্রটা হয়তো নীরস হয়ে উঠত । আর কোনও ক্ষতি হত কি ?

যাই হোক, স্বর্ণালঙ্কারে পানমোড়ার প্রয়োজন আছে কি নেই, শিবরামবাবুর রচনায় পি-ইউ-এন্—পান বাদ গেলে পান্‌সে হয়ে উঠত কি না, বা দেবদাসের চরিত্রে পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা—এ সবের কোনওটিই আমার উপস্থিত রচনার বিবেচ্য বিষয় নয় । এবং পানের মধ্যেও পচা খিলি নয়, মাদ্রাজি নয়, বাংলা নয়, সিঙ্গাপুরি নয়—আসল এবং অকৃত্রিম এক খিলি মিঠে পানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ।

খাদ্যের মধ্যে যেমন চাল, নেশার মধ্যে তেমনি পান সম্পূর্ণরূপে সাম্যবাদ বজায় রেখে চলে । মদের নেশা, তাড়ির নেশা, সিগারেটের নেশা, বিড়ির নেশা, আফিঙের নেশা, চণ্ডুর নেশা, সিদ্ধির নেশা, গাঁজার নেশা—নেশা অনেক রকমের । কিন্তু এর একটিও ধনী এবং দরিদ্র উভয়ের উপযুক্ত নয় । যেটি দরিদ্রের সাধ্যায়ত্ত ধনীর আভিজাত্যে তা ঘা মারে, যা অভিজাত তা দরিদ্রের পক্ষে ভোগসাপেক্ষ নয় । একমাত্র পান জিনিসটিই ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলে উপভোগ করতে পারে । মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পান কতখানি সম্মানীয় স্থান অধিকার করে আছে নীচের উক্তিগুলি থেকে তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ মিলতে পারে ।

—তুয়ার দওয়া এ পান খামু ক্যামনে বিবিজান, ইয়ার ভিতর যে তর প্রাণডারেও পুইর‍্যা দিছিস ।

—বাবু, পানো না খাইলে ত' মুই রাঁধিবারে পারিবনি । পানো ত' মোর জীবনো অছি ।

—আরে এ ভাই, তু চোরি করছিস, পকেট কাটছিস, ও ত ভালা

করছিস । লেকিন হামেভি ত দু'-চার পয়সা দিয়ে যাবি পান খাবার লেগে । পান-উন না খাইলে ত জরু খৈনি খেতে মানা কোরে ।

—ইয়েস, ওয়াইন্ ইজ ভের্‌রি গুড্‌ড, সিগগারেটো ইজ ভের্‌রি গুড্‌ড, কাফ্‌ফি টু ইজ ভের্‌রি গুডড্, বাট্‌টো, ইউ সি, ওয়ালট্রে পান্ ইজ ভের্‌রি ভের্‌রি গুড্‌ড ।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পানের মধ্যে প্রাদেশিকতা নেই । সব প্রদেশবাসীই এটিকে ভালবাসে । কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে পানের স্থান যে কত বিশিষ্ট, সম্ভবত অনেকেই তা ভেবে দেখেন না । সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরচৎচন্দ্র পান বাদ দিয়ে চলতে পারেননি, তবে উপযুক্ত সম্মান তাঁরা এই দ্রব্যটিকে দেননি ।

সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা একটি অতি-প্রয়োজনীয় গুণ এবং প্রেমের মতো সর্বজনীন ব্যাপার সম্ভবতঃ আর একটিও নেই । সেই কারণে অধিকাংশ সাহিত্যিক এই প্রেমের নানা রূপ ও রূপান্তর নিয়ে মাথা ঘামান । অথচ, এক শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কোনও সাহিত্যিক প্রেমকে পরিস্ফুট করে তুলতে সমর্থ হননি । তার কারণ, প্রেম প্রকাশ করবার একটা বিশিষ্ট টেক্‌নিক থাকা প্রয়োজন । শরৎচন্দ্র প্রণাম এবং প্রণামী (অর্থাৎ আহার্য দান) এই দু'টি পথে নায়িকাকে প্রেম-নিবেদন করতে বাধ্য করাতেন । অন্যান্য সাহিত্যিকরা এই পন্থাটি নকল না করে পানের দৌত্যে প্রেম-নিবেদন করতে পারেন ।

আমি লিখতে বসার আগে পর্যন্ত যে মেঘদূত, হংসদূত প্রভৃতি কাব্যের মতো পানদূত নামক কোনও মহাকাব্য রচিত হয়নি, তা কেবল বর্তমান কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তাশক্তির স্বল্পতাই প্রমাণ করে ।

বাঙালির ঘরে প্রেমের ক্ষেত্রে পানের একটা বিশেষ স্থান ছিল । তা, সে প্রেম দাম্পত্যই হোক্, বা স্বর্গীয়ই হোক্, স্বকীয়াই হোক্ বা পরকীয়াই হোক্ । বঙ্গ-ললনার আর্টজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত পানদানের রীতিনীতির ভেতর । স্ত্রী স্বামীকে পান উপহার দেবার সময় যথেষ্ট দাম্পত্য আলাপের সুযোগ পেত । রসালাপেরও । যথা, হাতে হাত ছুঁইয়ে পান দেওয়া, অর্ধশায়িত স্বামীর তন্দ্রামগ্ন মুখে পান গুঁজে দেওয়া, বা টিপয়ের ওপর পান-পাত্রে সযত্নে পান রেখে যাওয়া । এ ছাড়া স্ত্রীর অলক্ত-রঞ্জিত অধরোষ্ঠ যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করত, তাও এই পানের দৌলতে । কুমার-কুমারীদের প্রেমালাপেও পানের স্থান ছিল যথেষ্ট । পান দিতে আসার অজুহাতে নির্জনতা-প্রাপ্তি, পান দেওয়ার ফাঁকে পাণি-পীড়ন এবং নিপীড়নাত্মক প্রেমের প্রকাশ ছিল পানে চুন বেশি দেওয়া ।

মধ্যাহ্নের আতিথেয়তা বজায় রাখতেও পান ছিল অদ্বিতীয় ।

খুঁজে দেখলে পানের নানা উপকারিতা হয়তো পাওয়া যেত । কিন্তু পান মানুষকে সমাজ-সচেতন করে তুলতে পারে এ খবর জানেন ?

হ্যাঁ, পানের মধ্যে একটা বিরাট শিক্ষাও কখনও কখনও পাওয়া যায় । বিশাল একটা দর্শন । সেইটুকু বলবার জন্যেই এই আলোচনার সূত্রপাত ।

বাবুলালের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আজ থেকে পনেরো বছর আগে । আমার বয়সের অঙ্কটা তখন ঠিক কৈশোরের শেষ ধাপে । কিংবা সেটাকে যৌবনের প্রথম ধাপও বলতে পারেন ।

একটা রেলের কলোনিতে ছিলাম আমি । আমি আর বাবুলাল দু'জনেই । একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিল ওর, আর সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ গড়ে উঠেছিল ।

অনেক নগর নদী অতিক্রম করে পনেরো বছর পরে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম শহর কলকাতায় । আর বাবুলালকে আবিষ্কার করলাম এক নামজাদা সড়কের মোড়ে একটি পানের দোকানে । মিঠাই থেকে ঠাঁই বদলে বাবুলালও নাকি ঘুরেছে অনেক জায়গায় । সারা যুদ্ধটা কাটিয়ে এসেছে কাপড়ের কলে, তেলের আড়তে, চালের গুদামে । বেশ কিছু টাকা জমিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে একটা পানের দোকানে ।

আমার আবাস থেকে ওর দোকানটা যে অনেক কাছে, শুধু সেই কারণেই নয়, আমার সান্ধ্য আড্ডায় যাবার পথেই ওর দোকানটা । তাই নিত্যদিনের মতো সেদিন এক খিলি মিঠে পানের নেশায় ওর দোকানের উদ্দেশে চলেছিলাম । হাতে ছিল একটা না-ধরানো সিগারেট । পকেটে একটি ডবল পয়সা—এক খিলি মিঠে পানের দাম । বাবুলালের দোকান থেকে একটি মিঠে পান কিনে মুখে পুরে তার পর তারই দোকানের দড়িতে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সান্ধ্য আড্ডার দিকে পা চালাব, এই ছিল ইচ্ছা ।

চেনা-অচেনা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সত্যিকারের মানুষ দেখেছি খুব অল্প । বাবুলালের মতো হয়তো একজনকেও না ।

পনেরো বছর আগেকার একটা ঘটনা আমার আজও মনে আছে, এবং থাকবেও হয়তো বাকি জীবনটা ।

দশম বর্ষীয় ইস্কুলের ছাত্র আমি তখন, অতএব সংসারের একমাত্র বেয়ারা । কি যেন একটা পুজোর দিন । আমাকে আসতে হল বাবুলালের দোকানে—পাঁচ সিকের মিষ্টান্ন কিনে নিয়ে যাবার জন্যে ।

সন্দেশের ঠোঙাটা হাতে করে বাবুলালের দোকান ছেড়ে ঠিক পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চিল এসে ছোঁ মারল ।

পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেল সন্দেশের ঠোঙাটা ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ । ঠিক্ যেন বুঝতেই পারিনি কি হয়ে গেল ।

সংসারের অনেক কিছু করেও নিষ্কর্মার প্রতীক হতে হয় যে বয়সে, আমার তখন সেই বয়স । অতএব বুঝতেই পারেন, এর প্রতিফল কল্পনা করে আমার চোখে জল এসেছিল কি না ।

এমন সময় দেখলাম, বাবুলাল তার দোকান থেকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে ।

—কি হ'ল খোকাবাবু ?

জবাব দিতে পারলাম না ।

বাবুলাল বললে, এসো খোকাবাবু, আউর মিঠাই লিয়ে যাও হামার দোকান থেকে ।

বললাম, পয়সা তো নেই আর ।

উত্তর এল, ও কি তুমার দোষে নষ্ট হয়েছে ? লিয়ে যাও তুমি । পয়সা লাগবে না ।

এবং তার পর সত্যিই এক ঠোঙা সন্দেশ বিনা পয়সায় দিয়েছিল বাবুলাল ।

সেই বাবুলাল আজ পনেরো বছর পরে শহর কলকাতায় এক নামজাদা সড়কের মোড়ে পানের দোকান খুলেছে ।

একমাত্র সম্বল ডবল পয়সাটা, বাবুলালের হাতে দিয়ে বললাম এক খিলি মিঠে পান ।

সযত্নে পানটা সেজে একটু সুগন্ধি সংযোগ করে আমার হাতে দিতে গেল বাবুলাল । পাশাপাশি লোকের ভিড়ে হাতটা নড়ে যেতেই পানটা নীচে পড়ে গেল ।

পানটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী কে, ঠিক বুঝতে পারলাম না । আমার নিজেরও দোষ হতে পারে । হতে পারে বাবুলালের ।

আমি মুখ তুলে বাবুলালের দিকে তাকালাম ।

বাবুলালও তাকাল মাটিতে-পড়া পানটির দিকে ।

তার পর যথারীতি পান সেজে অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে মনোযোগ দিলে ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি । না, বাবুলালের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই এদিকে ।

অকারণ একবার পকেট হাতড়ালাম ! তার পর ধীরে ধীরে আড্ডার পথ ধরলাম । একটা মিঠে পানের অভাবে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল ।

কিন্তু না, মনে হ'ল না, বাবুলাল মানুষ বদলে গেছে । শুধু বুঝতে পালরাম, একটা সত্যিকারের যুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি আমরা । টাকার মর্ম বুঝতে শিখেছি । আর ? আর প্লাবনের পরে পলিমাটিই জমে না, পাঁকও জমতে পারে ।

বুঝলাম যুদ্ধ অনেক কিছু ধ্বংস করেছে । ধ্বংস করেছে মানুষের ব্যক্তিত্ব । যাকে বলা হয় পার্সোনালিটি ।

পার্সোনালিটি ।

'পার্সোনালিটি' শব্দটা আপনি যত লোকের মুখে শুনেছেন সেই সংখ্যার সঙ্গে ১৭৬০ দিয়ে গুণ করে যে সংখ্যা দাঁড়াবে তাকে ৪৪০ দিয়ে ভাগ করে তাকে আবার ৮৮০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে যা দাঁড়াল তাকে ১৭৬০ × যত লোকের মুখে আপনি 'পার্সোনালিটি' শব্দটা শুনেছেন তা দিয়ে ভাগ করলে যা ভাগফল হবে ঠিক ততগুলি লোকের সত্যি সত্যিই পার্সোনালিটি আছে ।

ওপরের এই গুণফলের গোলকধাঁধা অতিক্রম করার পর হয়তো দেখা যাবে, আমি যা বলতে চাই তার উল্টো ফল হয়েছে । অঙ্কে আমি চিরকালই একটু বেশি রকম কাঁচা । অঙ্কের উত্তরটা আগেই বলে দিচ্ছি—()—একটি বিরাট কিংবা বিবাটতম শূন্য । উত্তর না মিললে বুঝতে হবে অনুশীলনীর অঙ্কটায় ছাপার ভুল আছে ।

সহজ কথায় বলা চলে, 'পার্সোনালিটি' বলে কোনও কিছু পৃথিবীতে নেই । অন্তত আমার অভিধানে এ শব্দ নেই । আসলে আমরা পার্সোনালিটি বলতে যা বুঝি শব্দটার প্রথামংশেই তা স্পষ্ট করে লেখা আছে—পার্স । শুদ্ধ বাংলায় যার অর্থ হল মনিব্যাগ । পার্স শব্দটি থেকে যেমন পার্সিদের উদ্ভব—পার্সিরা সকলেই এক একজন জামেসদজি টাটার পার্স নিয়ে জন্মান বলে—তেমনি পার্সোনালিটি শব্দের উদ্ভব এই পার্স থেকে । ইংরেজরা পার্সকে যেমন প্রথমেই রেখেছে, বাঙালিরাও তেমনি per-সোনা-lity, শব্দের মধ্যমণি করে রেখেছে সোনাকে ।

আসল কথা হ'ল পার্সোনালিটি বলে কোনও কিছু নেই । পার্সকেই আমরা পার্সোনালিটি ভাবি, আর সেইজন্যেই চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে ডক্টরেট পাওয়া ছেলেও টাটা-বিড়লাদের সামনে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে । স্যার বীরেন মুখার্জির কথা ছেড়েই দিলাম, ডি. এন. চৌধুরী বা অধ্যক্ষ মথুরবাবু—যাঁদের ছবি বিজ্ঞাপনে দেখা যেত—ছবি দেখে দেখেও ত তাঁরা খানিকটা চেনা হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের, তবু তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত (interview) করতে হলে কোন্ ব্যক্তির না হাঁটুতে হাঁটু ঠেকবে ! অথচ আমার মনে আছে—মুরি স্টেশন থেকে রাঁচি যাচ্ছি ছোট লাইনের গাড়িতে—ঠিক নলিনী সরকারের মতো চেহারার এক

ভদ্রলোকের সঙ্গে দিব্যি হাসি ঠাট্টা করতে করতে এবং তাঁর সিগারেটের টিন শেষ করতে করতে—কই, একবারও ত মনে হয়নি ভদ্রলোকের personality আছে। অবশ্য রাঁচি স্টেশনে পৌঁছে যখনই জানতে পারলাম যে, নলিনী সরকারের মতো চেহারার লোকটি সত্যি সত্যি নলিনী সরকার, তখনই তাঁর চোখে মুখে, হাবে ভাবে, চলনে এবং চেহারায় শুধু পার্সোনালিটি আর পার্সোনালিটি—পার্সোনালিটির ছড়াছড়ি দেখতে পেলাম।

নিজের পার্স না থাকলেও অবশ্য পার্সোনালিটির থাকতে পারে। যেমন ধরুন মহাত্মাজির। মহাত্মাজির নিজের কোনও পার্স ছিল না বলেই শোনা যায়, অন্তত ট্যাঁকে গুঁজে রাখতে দেখা যায়নি। এক ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই বোধহয় ট্যাঁকে রাখতেন না তিনি—তবু মহাত্মাজির পার্সোনালিটির অভাব ছিল না। কারণ অপরের পার্সের ওপর তাঁর অধিকার না থাক্, প্রভাব ছিল। দু'হাত বাড়িয়ে একবার শেঠজিদের সামনে দাঁড়াতেই সব পকেটের পার্সই মহাত্মাজির হাতে এসে পড়ত।

মহাত্মাজির মতো হাত পেতেই যে অপরের পার্স এবং নিজের পার্সোনালিটি অর্জন করতে হয় তা নয়। আল কাপোন বা মিনা পেশোয়ারির মতো অপরের পার্স ছিনিয়ে নেওয়ার বা ভয় দেখিয়ে আদায় করবার শক্তি থাকলেও পার্সোনালিটি অর্জন করা চলে। সোদপুরে গান্ধীজির সঙ্গে আমি গুনে গুনে এগারোটি শব্দে আলাপ করেছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার, আল কাপোন বা মিনা পেশোয়ারির সামনে পড়লে অজ্ঞান হয়ে পড়ার সাহসটুকুও আমার হত না। কারণ এদের পার্সোনালিটি মহাত্মাজির চেয়ে অনেক বেশি—মহাত্মাজি অপরের পার্স নিয়ে সকলের জন্যে বিলিয়ে দিতেন, এরা সকলের পার্স নিয়ে নিজের জন্যে বিলিয়ে দিত।

মন্ত্রী, আপিসের বড় সাহেব, পাবলিসিটি অফিসার, সম্পাদক প্রভৃতির মধ্যেও পার্সোনালিটি আছে। তার কারণ, চাকরি, পারমিট, প্রোমোশন, বিজ্ঞাপন এবং কবিতা ছাপার মতো পার্স-বর্তী উপহার দেবার (অন্তত না দেবার) শক্তি এঁদের আছে। কবিতার বিনিময়ে অনেক ক্ষেত্রে টাকা পাওয়া যায় না, এ যুক্তি দিয়ে যাঁরা কবিতা ছাপাটা পার্সীয় ব্যাপার নয় ব'লে প্রতিবাদ করবেন ভাবছেন, তাঁরা স্মরণ রাখবেন একসময় ভারতবর্ষে টাকা দিয়ে কবিতা ছাপতে হ'ত অনেককে।

নামকরা গুণ্ডা, বড় বড় পুলিশ অফিসার, উকিল-ব্যারিস্টার জাতীয় লোকেরও পার্সোনালিটি থাকে, বিশেষ করে পুলিশ অফিসারদের। খেয়াল বা বদখেয়াল একটা জুটলেই হ'ল, এমন এক ক্ষুরধার ধারায়

আপনাকে ফেলে দেবেন যে, নিজের পার্স তো যাবেই, অপরের পার্স থেকেও ধার নিয়ে জামিনে খালাস হয়ে, উকিল ঠিক করে, তদ্বির তদারক করে, কোর্টস্ট্যাম্প এবং কালো কোটকে স্ট্যাম্প দিয়ে, সাক্ষীসাবুদ ভাড়া করে, দিনের পর দিন তিনহাজারি ভিড়ে তিন বেঞ্চির ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বসতে না পেয়ে ঘুরে ঘুরে পায়ে ব্যথা দেহে, ক্লান্তি, চোখে ঘুম, মনে বিরক্তি, ফুসফুসে ঘা ধরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে (আমাদের আইনে আসামির দোষ প্রমাণ না করা পর্যন্ত তাকে নির্দোষ ধরে নেওয়া হয় বলেই আসামিকে সসম্মানে, স-আরামে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কষ্ট করে বসে থাকতে হয় না) অজস্র টাকা খাওয়া উকিলের পাগলামি শুনে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ঘোষণার পর সিধে সেন্ট্রাল জেলে ঢুকে আপনি টের পাবেন, পুলিশ অফিসারটির পার্সোনালিটি কেমন জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করছে ।

অতএব পার্সোনালিটি বলতে মূলত পার্সই বোঝায়, তা সে নিজেরই থাক্ বা অপরের । অপরের পার্স জোর করে বা না-জোর করে আদায় করার শক্তি, নিজের স্বার্থবশত বা নিঃস্বার্থবশত অপরের পার্স ধ্বংস করার ক্ষমতা-- এ দুটোই পার্সোনালিটি ।

এ ছাড়াও তিন ধরনের পার্সোনালিটি আছে । (১) চেহারা (২) পরিবেশ (৩) প্রোপাগাণ্ডা ।

চেহারা । আপনি যদি সাত ফিট লম্বা হ'ন, দর্জি আপনার পুটের মাপ যদি বলে ৫৮, বুক ৫৬ (মেয়েদের বেলায় ৮৬), কব্জি ২৮—তাহলে চোখ দুটো আপনার ছাগলের মতো যত বোকা-বোকাই দেখাক—বুদ্ধিতে আপনি যত বড় গর্দভই হোন না কেন, আপনার পার্সোনালিটিতে কেউ অবিশ্বাস করবে না । বিশেষ করে চেহারাটা যদি বেশ খাসুরত হয় ।

পরিবেশ । ধরুন আপনি একজন আপিসের বড়কর্তা, সম্পাদক, বিজ্ঞাপনদাতা বা সিনেমা ডিরেক্টর । ধরুন আপনার চেহারা নেপোলিয়ন, মাও-সে-তুং, হিটলারের মতো । এক্ষেত্রে পার্সোনালিটি দেখাতে হ'লে একটি মাত্র উপায় আছে । খুব কম কথা বলবেন, সচরাচর কারও সঙ্গে দেখা করবেন না, দেখা করতে হলে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন, নির্দিষ্ট সময়ে লোকটি এসে পৌঁছলেও এবং সাক্ষাৎ করবার মতো অবসর থাকলেও বেয়ারাকে দিয়ে অনুরোধ জানাবেন একটু অপেক্ষা করতে, একটু বললেও অন্তত আধ ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করবেন । তারপর ? তারপর অত্যন্ত স্বল্প-আলোকিত একটি দুশো গজ লম্বা হলঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের আড়ালে শুধুমাত্র মাথাটি বের করে বসে থাকবেন—সামনে

একরাশ কাগজপত্তর এবং কয়েকটি হাতলহীন চেয়ার নিয়ে । এবং সেদিকেই মনোনিবেশ করার ভান করবেন । লোকটি সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই হকচকিয়ে যাবে, ঘরের কোথায় আপনি বসে আছেন খুঁজে পেতেই তার পাঁচ মিনিট সময় যাবে, তারপর দু'শো গজ পা টিপে টিপে সে এগিয়ে আসতে আসতেই নার্ভাস হয়ে পড়বে, যখন আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন চোখ না তুলেই নড করবেন, বসতে বলবেন না । সে কিছুক্ষণ কিন্তু-কিন্তু করে সামনের চেয়ারে বসবে, অবশ্য ভয়ে ভয়ে, তারপর চেয়ারে হাতল না থাকায় হাত দুটো পৃথক রাখতে পারবে না, তার নিজেরই অজান্তে দু'হাত একত্র হবে, হাত কচলাতে শুরু করবে সে, এবং তখনই বুঝবেন, আপনি কেল্লা মেরে দিয়েছেন । দু' একবার তোতলামি করেই লোকটি বেরিয়ে আসবে. আর বেরিয়ে এসেই বলবে 'হোয়াট্রে পার্সোনালিটি !'

প্রোপাগাণ্ডা । পার্সোনালিটি অর্জন করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল সেল্‌ফ-প্রোপাগাণ্ডার ব্যবস্থা করা । অর্থাৎ যতদিক থেকে সম্ভব প্রচার করতে হবে, আপনি একজন ভীষণ কিছু, বিচিত্র কিছু, অদ্ভুত কিছু, উদ্ভট কিছু, অসাধারণ কিছু, অর্থাৎ অনেক কিছু । ব্যস্‌, তা হলেই আপনার চোখে জ্যোতি দেখতে পাবে সবাই, ভুরুতে তীক্ষ্ণতা, কপালে দৃঢ়তা, চিবুকে চাবুক, নাকে সারল্য, গালে সৌম্যতা, কানে দু'কান-কাটাত্ব । প্রোপাগাণ্ডা না থাকলে হিট্‌লারকে লোকে ইটলার বলেই ক্ষান্ত হত না, রাস্তাঘাটে ইট ছুঁড়ত । তেমন তেমন প্রোপাগাণ্ডা হয়নি বলেই পাবলো নেরুদাকে পাবলো নেরুদা বলি, অরচ জওহরলাল নেহরুর পিছনে পাশে ওপরে নীচে সামনে পঞ্চদিকে প্রোপাগাণ্ডা ছিল বলেই সাহস করে কেউ তাঁকে নেহরুদা বলতে পারেনি ।

এ সব গেল পার্সোনালিটি অর্জনের কথা । আপনার যদি সত্যি সত্যি পার্সোনালিটি থাকে, আর আপনি যদি তা হারাতে চান, তা হলে তিনটি জায়গায় যেতে পারেন । কফি হাউস, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, হাওড়া স্টেশন ।

৬

কিন্তু পার্সোনালিটি ফিরে পাবার পথ—প্রেম। আমরা যাদের গুড ফর নাথিং ভাবি সেই সব বোকা-বোকা চেহারার মধ্যেও কতখানি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, যখন তাদের পাশে থাকেন কোনও রূপবতী। বোকা বোকা চেহারাও তখন ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

সত্যি কথা বলতে কি, কমলা লেবুর মতো আমাদেরই নরকে একমাত্র স্বর্গ হল প্রেম। আর সাদি না হাফিজ কে যেন বলেছিলেন, প্রেমের পৃথিবীতে একমাত্র স্বর্গ হল চুম্বন। বয়েত্‌টা মনে আছে :

আগর আঁ তুর্ক সিরাজি বদস্ত আরদ্ দিলে মারা
বাখালে হিন্দুয়াশ বেবক্সম্ সমরকন্দ বোখারারা।

অনিন্দ্যসুন্দরী এক সিরাজি মেয়ের প্রেমে পড়ে কবি বলেছিলেন, ওই সিরাজি কন্যার আনার-গালের ওপর যে কালো তিল রয়েছে তার ওপর আমার ঠোঁট যদি ছোঁয়াতে পাই তো হিন্দুস্তান, সমরকন্দ, বোখারার সিংহাসন ছেড়ে দিতেও রাজি আছি। এ-কথা অবশ্য কবিবিশেষ বলতে সাহস পেয়েছিলেন এই কারণেই যে, তিনি ওই তিনটি দেশের একটিরও সম্রাট ছিলেন না। অবশ্য তিনি যদি সত্যিই সম্রাট হতেন এবং তাঁর বাসনা যদি চরিতার্থ হত তা হলে সিংহাসন তাঁকে ছাড়তে হত নিশ্চয়ই। কারণ ইতিহাস পড়লে দেখবেন, সম্রাটদের পক্ষে প্রেম হল নীচস্থ রাহু আর শনির দৃষ্টি। প্রেমের জন্য কত রাজ্য ছারখার হয়েছে, কত সম্রাট প্রাণ হারিয়েছে।

ওপরের বয়েত্‌-লেখক অবশ্য প্রেমের চেয়ে চুম্বনকে মহিমান্বিত করেছেন। কিন্তু চুম্বন কি সত্যিই প্রেমের প্রকাশ ?

একের অধরে অপরের ওষ্ঠ মিলিত করাকেই বলে চুম্বন। শুধু অধর এবং ওষ্ঠেই নয়, অধরে অধরে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে, এমন কী একের অধরোষ্ঠে অপরের কেবল মাত্র অধর স্পর্শিত হলেও তাকে চুম্বন বলা হয়। এছাড়া একের অধরোষ্ঠ অন্যের যে কোনও দৈহিক অংশে, যথা চুল, চোখ, কপাল বা গাল ইত্যাদিতে রক্ষিত হলেও তাকে চুম্বন বলে।

দেহতত্ত্বের অধিকাংশ অনুসন্ধান-অধ্যাপকের চোখে চুম্বন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ দৈহিক। তাঁরা বলেন, অধর ও ওষ্ঠের সঙ্গে মানুষের যৌনজীবনের নিকট সম্বন্ধ আছে। মানুষ চুম্বন করে যৌনতৃপ্তি পায়।

আমার ধারণা কিন্তু চুম্বনের সঙ্গে দেহের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই।

চুম্বন জিনিসটি মানুষের হাজার হাজার সংস্কারের মতোই একটি সংস্কার মাত্র। একটি মিথ্যা যেমন বহুলপ্রচারের দ্বারা সত্যে রূপান্তর পায়, তেমনি সামাজিক প্রথাও বহু শতাব্দীর প্রভাবপুষ্ট হয়ে সংস্কারে রূপান্তর পায়। এবং সংস্কার ক্রমশ বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে ওঠে।

চুম্বনরূপ সামাজিক সংস্কারটি সর্বদেশে এবং সর্বকালে অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে। যদি তা না হত, তা হলে এমন কিছু ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। অবশ্য সাহিত্যিক ও কবিদের ক্ষতি হত যথেষ্ট। কারণ শতকরা একশতজন কবি ও কথাশিল্পী প্রেম বা স্নেহ বোঝাতে হলে, বা বাৎসল্য রস ফুটিয়ে তুলতে হলে চুম্বন ছাড়া অন্য কোনও সহজলভ্য উপায় খুঁজে পান না। এক শরৎচন্দ্রই ব্যতিক্রম। প্রণাম ও প্রণামী, অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে চরণস্পর্শ করে প্রণাম করে তাঁর প্রেমিকারা, আর থালাভরা ভালমন্দ খাদ্যের প্রণামী দিয়ে প্রেম নিবেদন করে। অজস্র অশ্রু আর বকুল ফুলের মালা বা বৈঁচির মালাও এই প্রণাম ও প্রণামীর মধ্যেই পড়ে। কারণ, অশ্রু বিসর্জনের পরে, তাঁর প্রেমিকারা প্রেমিকের ফটোর পায়ে মাথা রাখে, আর প্রেমিকারা বৈঁচির মালা গলায় না পরে মুখে পারে। কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখা রচনাতেও, বিশেষ করে যৌনজীবনকে যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্তের ন্যায় দূরে রাখেন, তাঁদের রচনাতেও চুম্বন স্থান পায়। অতএব, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কবি ও কথাশিল্পীরা চুম্বনকে ফ্রয়েড বা এলিসের চোখে দেখেন না, তবে এ কথাও সত্যি যে, তাঁরা আমার মতো এটিকে সংস্কারমাত্রও মনে করেন না।

আফ্রিকার কাফ্রিদের মধ্যে চুম্বনপ্রথা বিরাজ করে কি না তা এক রামনাথ বিশ্বাসই বলতে পারতেন। চীনদেশে নাকে নাক ঘষে যে অভিবাদন জানানোর রীতি আছে তাও সম্ভবত নমস্কারের প্রতিনিয়ম, চুম্বনের নয়।

যাই হোক, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে ও সমাজে চুম্বন প্রথা এখনও রয়েছে।

আপনারা নিশ্চয় এখনও আপনাদের স্ত্রী বা প্রেমিকার অধরে অধরোষ্ঠ স্পর্শ করে চুম্বন করেন। কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে, এইট একটি সংস্কারমাত্র। তাই যদি না হয় তো আপনি আপনার গুরুজনদের সামনে বা সর্বসমক্ষে রাস্তায় ঘাটে, আপনি যদি পুরুষ হন তো প্রেমিকার, নারীর স্থলে প্রেমিকের, মুখচুম্বন কেন করেন না?

এর উত্তরে আপনারা হয়তো বলবেন যে, চুম্বন ব্যাপারটা সংস্কার নয়,

সাধারণের সমক্ষে বা গুরুজনের সামনে চুম্বন করাটাই রীতিবিরুদ্ধ । এবং উদাহরণ দেখাবেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় কোনও দম্পতিকে চুম্বনরত দেখলে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' বলে কেউ চিৎকার করে ওঠে না ।

তথাস্তু । প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আপনারা যখন খুশি হবেন না, তখন তারই ব্যবস্থা করা যাক্ ।

আপনি আজই বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে একটু আদর সোহাগ করবেন । চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় ছাদের কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্যদিনের মতোই ফিসফিস করে তাঁকে প্রেমের বাণী শোনাবেন । তারপর ক্রমশ যখন তাঁকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করবার সময় আসবে সে-সময় অত্যন্ত প্রেমবিগলিত নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি গাঁট্টা মারবেন । এরপরই আপনাকে হয়তো গোটাকয়েক গাঁট্টা খেতে হবে । কিন্তু সেটুকু কি প্রেমের জন্য সহ্য করতে পারবেন না ? চুম্বন করে ফেরত পেতে যখন ভাল লাগে তখন এটুকুও আপনার ফেরত পেতে ভাল লাগাই উচিত ।

ফলে দিনতিনেক হয়তো আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী কথা বন্ধ রাখবেন । তারপর আবার কথা শুরু হবে, আবার সেই ছাদে ডেকে আনবেন তাঁকে, প্রেম নিবেদন করবেন, এবং তারপর আবার গাঁট্টা । এইভাবে চলতে থাকলে ক্রমশ গাঁট্টা মারা ও গাঁট্টা খাওয়াটা আপনাদের উভয়েরই সহ্য হয়ে যাবে । এবং আপনাদের দেখাদেখি পাড়াপড়শিরাও চুম্বনের বদলে গাঁট্টা মারতে থাকবে নিজ নিজ স্ত্রীদের । ক্রমে, শত বর্ষ বা সহস্র বর্ষ পরে এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যেদিন গুরুজনের সামনে যদি কোনও পুরুষ কোন নারীকে চুম্বন করে তা হলে গুরুজনটি বিস্ময়ে চেয়ে থাকবেন । কিন্তু কোনও স্বামী যদি কোনও স্ত্রীকে তাঁর সামনে গাঁট্টা মেরে বসে তা হলে গিন্নি লজ্জায় আধ হাত জিভ কেটে একহাত ঘোমটা টানবেন ।

অতএব চুম্বন ব্যাপারটা যে সংস্কারমাত্র তা যদি প্রমাণ করতে চান, তা হলে আজ থেকেই গাঁট্টা মারতে শুরু করুন । দেখবেন কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই গাঁট্টা মারাটাও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে ।

কিন্তু ফ্যাশন বস্তুটা কি ভেবে দেখেছেন কখনও ?

৭

"ফ্যাশনটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী।" শেষের কবিতা লিখতে যিনি উপন্যাস লিখে বসেন, স্যাটায়ার লিখতে গিয়ে মনস্তত্ত্ব—এ লাইনটা তাঁরই লেখা। অর্থাৎ অমিতর জীবনচরিত যিনি লিখে গেছেন সেই রবীন্দ্রনাথর রচনা এটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ তুলনামূলক ব্যাখাটি সার্থককল্পনা নয়। কারণ, বলা উচিত যে স্টাইলটা হল মুখোশ, আর ফ্যাশান মুখবিশ্রী।

পাড়াগাঁয়ের নতুনবউ যখন কাঁখে কলসী নিয়ে গাগরীভরণে ঘাটের পথ ধরেন, তখন তাঁর মুখশ্রীর অভাব হয় না। কিন্তু পল্লীবধূর স্টাইল তখনই প্রকাশ পাবে যখন বেনারসির থ্রি-কোয়ার্টার ঘোমটার পাশ থেকে ভ্রূবিলাস দেখাবেন তিনি। ফ্যাশনটাও মুখোশ নয়, ফ্যাশনেবল্‌রা মুখোশকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করে চলেন। মুখোশ দ্রব্যটি মানুষের চেহারাকে অদ্ভুত করে তোলে, ফ্যাশনেবল্‌রা অদ্ভুত হবার দুঃসাহস রাখেন এ-কথা বলা যায় না। অর্থাৎ কোনও কিছুর অরিজিন্যালিটি দেখাবার ভার স্টাইলিস্টদের। এবং প্রতিভাবান স্টাইলিস্টদের অনুসরণ করেন ফ্যাশনেব্‌লরা। কোনও বিশিষ্ট স্টাইলিস্টের ওপর যখনই সমাজ শুভদৃষ্টি ক্ষেপণ করে, তখনই ফ্যাশনেবল্‌রা সেই স্টাইলের অনুকরণ করেন, আগে নয়। আর তাঁদের অনুকরণের ফলে স্টাইল ফ্যাশনে রূপান্তর পায়।

বুদ্ধ, অশোক, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ—এঁরা ছিলেন স্টাইলিস্ট। শঙ্করাচার্য, বল্লাল সেন,—এঁরা হলেন ফ্যাশনেবল্‌। অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন স্টাইলিস্টরা, ফ্যাশানেবল্‌রা করেন মক্‌সো।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু প্রয়োজনীয়—সবের মধ্যেই এই স্টাইল আর ফ্যাশনের অবোধ্য একটা দ্বন্দ্ব চলছে।

স্টাইলের শত্রু ফ্যাশন, ফ্যাশনের শত্রু স্টাইল। প্রতিভাবান এবং শক্তিমানদের অস্ত্র স্টাইল, দুর্বলদের ফ্যাশন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ দু'জনের দ্বৈবথ দ্বন্দ্বে স্টাইলই হয় পরাজিত, ফ্যাশন জয়ী। কারণ এ যুগটা হল ডেমোক্রেসির যুগ, অর্থাৎ দুর্বলের যুগ। ব্যক্তিগতভাবে একজন শক্তিমান যেমন গোষ্ঠীগত দুর্বলদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়ান রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি অজস্র অনুকারকের হাতে স্টাইলিস্ট হন পরাজিত।

বহু অর্থব্যয় করে আপনি চীনে কোট কিনে আনুন নতুন ধরনের, দু'দিন পরেই দেখবেন পাঞ্জাবি বাসকণ্ডাক্টাররাও সেই ধরনের কোট পরছে। আপনি তাদের পোশাক বদলাতে বাধ্য করতে পারবেন না, ফলে আপনাকে আবার বানাতে হবে একটি জাপানি কোট। এবং অবাঙালি ট্রাম কন্ডাক্টাররা দু'দিনের মধ্যেই সেই জাপানি কোট ধরবে। সর্বদেশের স্টাইলিস্টদের মধ্যেই এই পরাজয়ী মনোবৃত্তি দেখা যায়।

"আলিবাবা" চিত্রে শ্রীমতী সাধনা বসুর 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানটিতে তাঁর নিজস্ব স্টাইল ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁরই পাড়ার জমাদারনির কাছে ওই গানটি শোনার পর থেকে শত অনুরোধ সত্ত্বেও নাকি তিনি ওই গানটি আর গাইতে চাননি।

বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পাস করেছিলেন এবং সাহিত্যিক হয়েছিলেন। তাই সে যুগে হবু-সাহিত্যিকদের মধ্যে বি-এ পাস করার ধুম পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কলেজের মুখ দেখেননি, তাই তাঁর সময়ের কবিরা কলেজের মুখ দেখতেন না, খাতায় নাম থাকলেও। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যিকরা সকলেই কিছু কিছু পড়াশুনা করেছেন। তাই তরুণ সাহিত্যিকদের পড়াশুনো করার ভান করতে হয়।

এ যুগে ফ্যাশনের আদরই বেশি, স্টাইলের কদর কম। আমেরিকা দেশটায় স্টাইল বলে কোনও শব্দ অভিধানে আছে কি না সন্দেহ। স্টাইলিস্ট সেখানেও আছে, কিন্তু ফ্যাশনেবল্‌রা সেখানে এতই তৎপর যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সেখানে কোনও রকমেই থাকতে পারে না। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন বিখ্যাত নটী স্টাইল দেখাবার চেষ্টা করেন। যত অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের বেশভূষার আমদানি করেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতে তিনি দেখতে পান যে, সকলেই সেই পোশাক পরেছে। বিরক্ত হয়ে তিনি শেষে একদিন কিছু না পরেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। পরদিন খবরের কাগজে বড় বড় হরফে খবর বের হয় যে ক্যালিফোর্নিয়ায় সেই সারা শহরটি নাকি ন্যুডিস্ট কলোনিতে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এ যুগে সকলেই ফ্যাশনেবল্। স্টাইলিস্টদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমার মতে যাঁরা আজও গৃহিণী সংগ্রহ না করে ব্যাচেলারত্ব বজায় রেখেছেন, তাঁরা হলেন স্টাইলিস্ট, আর যাঁরা বিয়ে করে গৃহিণীকে গৃধিনী ভাবছেন তাঁরা হলেন ফ্যাশনদুরস্ত। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিয়ে করেছেন তাঁরা হয়তো চটে যাচ্ছেন এই অপ্রিয় সত্য বলার জন্যে। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন যে, যাঁরা বিয়ে করেছেন, এবং বিয়ে করে গোপনে আঙুল কামড়াচ্ছেন, তাঁরা যখন সংখ্যা-গরিষ্ঠতার

দৌলতে বিবাহের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তখন আমাদের মতো অবিবাহিত লোকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা কত কঠিন হয়ে ওঠে ! শুধু বিবাহিতা মহিলারাই নয়, বিবাহিত মহলের পুরুষরাও, লক্ষ করে থাকবেন, কারণে অকারণে উপদেশ দিয়ে বসেন,—বিয়ে করো । আরে বাপু, আমি বিয়ে করি আর না করি তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন ? ঘরে বসে আছি চুপ করে, হয়তো ভাবছি একটা গল্পের প্লট, পিছনে নির্ঘাত শোনা যাবে বউঠাকুরাণীটির কণ্ঠস্বর—বিয়ে করো ঠাকুরপো, বিয়ে করো ! কিংবা ধরুন, মাথা ধরেছে, অসুস্থ বোধ করছি, উপদেশ আর ওষুধ কি—না, বিয়ে করো । কফি হাউসের করুণায় রাত্রির নিদ্রাটা নষ্ট হল কোনও দিন—বিয়ে করো । মার্কেটিং করতে গিয়ে কোনও একটা জিনিস আনতে ভুলে গেলাম—বিয়ে করো । পাশের বাড়ির ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিলাম—বিয়ে করো : ছাদে পায়চারি করলে—বিয়ে করো । বিয়ে জিনিসটা পেনিসিলিন না এম-বি সিক্স নাইনটিথ্রি যে ঋষিপ্রদত্ত মাদুলির মতো ওলাউঠো থেকে শুরু করে উদরাময় পর্যন্ত সব সারিয়ে দেবে ? কিন্তু মশাই বলব কি, আমাদের এ পৃথিবীটা হল এক বিচিত্র জায়গা আর আপনারাও হলেন সব বিচিত্র জীব । লাঙ্গুল যার কাটা সে সকলকেই লাঙ্গুল কাটতে বলে তাই জানা ছিল, বিবাহিত মহলে ঘোরাফেরা করে দেখি এখানে লাঙ্গুল যাঁরা জুড়েছেন তাঁরা সকলেরই পিছনে একটা লাঙ্গুল জুড়ে দিতে চেষ্টা করেন ।

পৃথিবীসুদ্ধ লোক যদি চিৎকার ক'রে কেবল 'বিয়ে করো', 'বিয়ে করো' বলতে থাকে, তাহলেও সহ্য করা যায় । কিন্তু কয়েকজন এঁদের মধ্যে আবার নির্যাতনের আর্টে এতই দক্ষ যে কথা না বলেও ভাবে ভঙ্গিতে তাঁরা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিতে পারেন ।

এমন বহু দম্পতি আছে, যাদেব মধ্যে দু'বেলা হাতাহাতি হচ্ছে, অথচ যান তাদের বাড়িতে, দেখবেন একেবারে হরপার্বতী ব্যাপার । যেন, দু'য়ে মিলে এক আত্মা, এতটুকু বিরোধ নেই । দুনিয়ায় যেন সুখী তাদের মতো আর কেউ নেই । কত সখ, কত সোহাগ, কত আব্দার, কত ঢং । কেন ? বাঃ—আমরা যে বিয়ে করেছি । তুমিও বিয়ে করো—

এ বিচিত্র ব্যবহারটিকে অনেকে নিরানন্দের ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্লেজ করা অ-সুখ মনে করেন । আসলে কিন্তু তা নয়, এ ব্যবহারের জন্ম হচ্ছে পীড়নবাদ থেকে । অর্থাৎ আমরা কত সুখী তা চোখ চেয়ে দেখো, আমরা যে বিয়ে করেছি, আর তুমি ? ছোঃ, বিয়েই হয়নি এখনও ?

এর চেয়েও অভদ্র ব্যবহার বিবাহিত মেয়েদের । ট্রামে বাসে, সিনেট-হল থেকে সিনেমা-হল অবধি যে-কোনও জায়গায় পরিচিত

কোনও বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই কেমন যেন এক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃপা বর্ষণ করেন তিনি—আহা, ছেলেটির বিয়ে হয়নি এখনও ।

আরে বাপু, হয়নি তো হয়নি, তাতে তোমার দুঃখটা কিসের ? আমি যে নিজেই ইচ্ছে করে বিয়ে করিনি, এবং ইচ্ছে থাকলে যে বাংলা দেশে মেয়ের অভাব হত না, তা যেন এঁরা বুঝতেই চান না ।

অথচ, মুখের ওপর একথা বলবারও উপায় নেই, লেগে যাবে আরেকটা দাঙ্গা, বিবাহিত আর অবিবাহিতদের মধ্যে । প্রহারটাও ভোগ করতে হবে আমাদেরই, কারণ পৃথিবীতে এমনিতেই আমরা সংখ্যালঘু, তার ওপর আবার অবিবাহিতা মেয়েরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হয়তো যোগ দেবে বিপক্ষের সঙ্গে ।

আমার কখনও কখনও মনে হয় যে, এই পৃথিবীতে অবিবাহিতদের প্রবলেমটাই আসল মাইনরিটি প্রবলেম । কিন্তু কোনও ব্যাচেলারই আজ পর্যন্ত পাকিস্তান তো দূরের কথা, প্যালেস্টাইনও চাইল না । অথচ, এটা নিঃসন্দেহ যে, অবিবাহিতদের দুঃখের দিন আসছে । যাঁরা বিবাহিত হয়ে গৃহধর্ম পালন করছেন, তাঁরা আর কিছুদিনের মধ্যে অগৃহীদের নিগ্রহ করে গ্রহান্তরে যেতে বাধ্য করবেন, একথা আজও কেউ ভেবে দেখছে না ।

বিবাহিতা মহিলাদের নির্যাতনের আর একটি বিশেষ রূপ অনেকে লক্ষ করে থাকবেন ।

হিন্দু মেয়েদের সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর বিবাহের নির্দোষ বিজ্ঞাপন নয় । এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে কয়েকটি কথা—আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমি সুখে আছি, আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসে, ইত্যাদি ।

বেশ তো ! কিন্তু কথাটা কি এভাবে ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ট্যাঁকট্যাঁক করে না বললেই নয় ? আর জানাবেই যদি তো মুখে প্রকাশ করেই বলো না, পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলো, যাতে দুটো কড়া কড়া উত্তর শুনিয়ে দিতে পারি । তা নয়, বলবে ঘোমটা বা সিঁদুরের দৌত্যে ।

পৃথিবীতে যা কিছু জ্ঞান আর বিজ্ঞান, যা কিছু জানবার, শোনবার এবং বলবার আছে, তাও বিবাহিতাদের একচেটে । এই সেদিন, শুনলে আশ্চর্য হবেন, একটি চেনা মেয়ে, যার বিয়ে হয়েছে এই সাত দিন আগে, যে দাদা বলত আমাকে (অবশ্য এখনও বলে), যে ইয়ার্কি তো দূরের কথা, মুখ তুলে কথা বলতে পারত না, সে কিনা মুরগির ডিম পাড়া নিয়ে তর্ক হতে আমাকে বলে বসল, ডিম পাড়াপাড়ির খবর তুমি কি জানো, বিয়েই হয়নি এখনও !

বুঝুন ব্যাপার ।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয় । মুরগি জীবনে যে প্রথম-ছড়া ডিম প্রসব

করে তা সম্ভব হয় প্রাকৃতিক কারণেই, তার জন্যে প্রয়োজন হয় না কোনও মোরগের সংস্পর্শে আসার । অবশ্য সেই প্রথম ছড়া ডিমে হাজার তা' দিলেও বাচ্চা বের হবে না । এ হল গিয়ে জীবতত্ত্বের কথা, বই পড়েই শেখা যায় । কিন্তু কে শুনবে আমার কথা, আমার যে বিয়েই হয়নি !

বৃদ্ধা এবং বর্ষীয়সীদের মজলিসে সিঁথির সিঁদুরের দৌলতে বারো বছরের একটি মেয়ে আসন পায়, অথচ তিরিশ বছরের অবিবাহিত পুরুষকে দেখে বলে উঠবে—ছেলেমানুষরা এখানে কেন ?

যে সব মহিলার আবার পুত্র-কন্যা আছে, তাঁদের নির্যাতন আর এক ধরনের ।

আপনি হয়তো তাঁর ছেলেমেয়েকে ভালবাসেন না, অর্থাৎ কোলে নেন না (চামড়ায় ঢাকা কুইনিন আর সর্দি পিণ্ডকে তো কোলে নেওয়া যায় না), সুতরাং আপনি বেরসিক, অমানুষ, অভদ্র—আরও কত কি ! আবার যাঁর ছেলেমেয়ে বেশ সুশ্রী, সেখানে বিপরীত ব্যাপার । কোলে নিতে গেলেই—আঃ, মঞ্জুটা এমন অসভ্য হয়েছে, কেউ এলে এত জ্বালায় ! যাও, বাইরে যাও—খেলা করবে ।

না মশাই, আপনাদের এ পৃথিবীতে আর থাকা চলবে না । হে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা, তোমাদের চতুষ্পদে দণ্ডবৎ, অনুগ্রহ করে তোমরা আমাদের পাকিস্তান সদৃশ কিছু একটা দিয়ে দাও, আমরা নির্বিঘ্নে বাস করি । আর তাও যদি না পার, দয়া করে তোমাদের অত্যাচার একটু কম করো ।

আর তাও যদি না পার, শীঘ্র করে আমাদের জন্য পাত্রী জোগাড় করে বিবাহ দিয়ে দাও ।

৮

কিন্তু বিয়ে করার আগে আপনাকে আরেকটা ভাষা শিখে নিতে হবে । সে ভাষার নাম হরেকরকমবা ।

নাম শুনেই যেন অচমকা চমকাবেন না । পাশ্চাত্যে এ জাতীয় কথাকে বাক্‌বিকৃতি বা স্পুনারিজম্ বলে থাকে ।

অক্সফোর্ডের স্পুনার সাহেব, যাঁর নাম থেকে এই স্পুনারিজম কথার উৎপত্তি, তাঁকে যদি জিহ্বার জড়তা বশত বলে ফেলেন, পক্সফোর্ডের সুনার সাহেব-—তা হলে সেইটেই হবে স্পুনারিজমের সব চেয়ে বড় উদাহরণ । অবশ্য স্পুনার সাহেবের নামের সঙ্গে যে শব্দভঙ্গিমা জড়িত হয়ে রয়েছে তা জিহ্বার জড়তার জন্য নয় । মিঃ স্পুনার যা কিছু বলতেন বা লিখতেন তা অনেকখানি চেষ্টাপ্রসূত ।

পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'যশুরে কৈ' না বলে 'কশুরে যৈ' বলাও নিশ্চয় হঠাৎ হয়নি । বহুকাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় 'বনফুল' যে "বকিতা" লিখেছিলেন তাও এই স্পুনারিজম-জাত ।

পিতার সামনে কোন মেয়ে যদি পুরুষ বন্ধুকে বলে ফেলে, 'একটা চুমু দিয়েই দেখুন না', তা হলে চায়ে চুমুক দেবার ভান করে মাথা নীচু করা ছাড়া পুরুষ বন্ধুটির আর কোনও উপায় থাকে না ; কিন্তু স্পুনার যখন কোনও এক বিবাহিতা রমণীকে বলে বসলেন, 'ম্যাডাম, উইল ইউ প্লিজ টেক মি ?' তখন সেই বিদুষী রমণী উত্তর দিলেন, 'নো মিঃ স্পুনার, বাট আই ক্যান মেক্ টি ফর ইউ ।' নেহাত এঁরা দু'জনেই পাশ্চাত্যের অলজ্জ আদর্শে মানুষ হয়েছিলেন বলে 'মেক্ টি'র স্থলে 'টেক্ মি' বলায় কৌতুক বোধ করেছিলেন । আমাদের অতিরিক্ত কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালি সমাজে অবশ্য এ ধরনের উক্তি দুঃখের কারণ হত ।

তোতলামির বৈজ্ঞানিক কারণ যদি হয় বেগবান চিন্তাশক্তি, তা হলে এই ধরনের উল্টো-পাল্টা কথা বলার কারণ হবে বহু চিন্তার সমাবেশ । অর্থাৎ অন্তর্মনের চিন্তার সঙ্গে বাক্‌শক্তির বক্রতা মিশে স্পুনারিজমের জন্ম ।

পুরাকালের কাহিনী : কাছারি থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় স্বামী ওজর দেখায়, 'কি করব, রাজার কাছ থেকে সনদ এসেছিল যে ।'

স্ত্রী কথাটি শুনলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে উত্তর এল, 'ঝাঁটা

মারি অমন ননদের মুখে ।'

অবশ্য, 'মামী সারলে বাঁচি' বলতে গিয়ে কোনও গৃহিণী যদি বলে বসেন, 'স্বামী মরলে বাঁচি,' তা হলে নিশ্চয় করে বলা চলে না যে, মনে মনে তিনি স্বামীর মৃত্যু কামনা করেন ।

স্পুনারিজম সব সময়েই জিভ পিছলে বের হয় না । কোডের ভাষায় গোপন ভাব আদান-প্রদানের জন্যও এর ডাক পড়ে । দু'বাড়ির দুটি যুবতী মেয়েকে স্বচ্ছন্দে পরস্পরের প্রেম ও প্রেমিকের সম্বন্ধে এ ভাষায় গল্প করতে শুনেছি নিজের কানে ।

—খুব ভাল্ কেমিং করছিস, না ?

—তুইও তো বাজিত অবুর সঙ্গে খুব খোচ চাওয়াচাওয়ি রকিস ।

—খোচে খোচ পড়লে কাতাব না ? তা বলে তোমার মতো উবান পেবু আমাকে দাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিক্ করে না ।

—সিক্ না করুক, কুবে কুব দিয়ে শুয়ে থাকো তো !

এইভাবে এদের বাক্যালাপ চলছিল । অথচ, সেদিন দু'বাড়ির বর্ষীয়সীরা শুনেও চট করে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি ।

স্কুলের ছেলেরাও এইভাবে শিক্ষকদের সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে মন্তব্য পেশ করে । কেকো টাত্তিক অর্থাৎ টেকো কাত্তিকের ক্লাসে অঙ্ক না পারলে মেরে চিঠের পামড়া তুলে দেয় । সুঁটে বেবোধ অর্থাৎ বেঁটে সুবোধ আজ চটে আছে, তার কারণ রৌ বাত্রে বথা কলেনি ।

আর এই 'হরেকরকমবা' ভাষা আপনাকে শিখে নিতে হবে বিয়ের আগেই । তা না হলে, কে বলতে পারে, আপনার সামনেই আপনার গৃহিণী এই কোডের ভাষায় সখীর সঙ্গে কি-না-কি আলোচনা করে বসেন ।

সাহিত্যিকরাও এ ভাষার আশ্রয় নিতে পারেন ।

বাংলা রসরচনায় অনুপ্রাস ও পান্ এত বেশি ব্যবহার করা হয় যে 'হাসি' কথাটি দেখলেই বোঝা যায়, এর পর আসবে হাঁস, হাসাহাসি, হাঁসুলি, হুসহাস, হোস পাইপ, হিসহিস, হেসাকবাতি থেকে হিসি পর্যন্ত ।

কিন্তু প্রথমেই তো বলেছি, এ ভাষার সবচেয়ে বেশি আদর হওয়া উচিত প্রেমের ক্ষেত্রে । কোডের ভাষায় কথা কওয়ার জন্যেও অন্তত স্পুনারিজমের দীর্ঘায়ু কামনা করা প্রয়োজন ।

প্রেমের কথা উঠলেই কেন জানি না, নীল শাড়ি পরা একটি যুবতীর রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর মনে পড়ে সেই বিখ্যাত পদ : চলে নীল শাড়ি...

৯

হায় নীল শাড়ি ! কোনওদিন ভুলতে পারব না তার কথা । 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর ।'

বহুজনের মুখ থেকে এ লাইনটির আবৃত্তি শোনবার সৌভাগ্য আমার মতো আরও অনেকেরই হয়তো হয়েছে ।

বহুবার এ পঙক্তিটি বিভিন্ন সুরে ও স্বরে শুনেছি ।

কিন্তু একদিন চমকে উঠেছিলাম ।

ফেত্‌তা-কাপড় রক্‌-আড্ডা বিড়ি-মুখো একটি ছোকরার ঝাঁজালো কণ্ঠেই লাইনটির আবৃত্তি ঘটেছিল । মনে আছে, ফিরে তাকালাম । এবং অন্য দিকে ফিরে তাকিয়ে ছোকরার স্বতঃস্ফূর্ততার কারণ অনুধাবন করলাম ।

'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর ।'

অদূরের নীল-শাড়ি-পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, পদাবলীর এই পদটি মোটেই ওই মেয়েটির প্রতি প্রযোজ্য নয় ।

কারণ ?

কারণ, এই লাইনটি শুনলেই আমাদের—অন্তত আমার মনে একটা বিশেষ ছবি ছায়াপাত করে ।

অপূর্ব সুন্দরী তরললাবণ্যময়ী একটি মেয়ে এবং তার সারা দেহে একটি ভিজে নীল শাড়ি—যা সে নিঙড়োতে নিঙড়োতে চলেছে ।

শুধু কি তাই ? না । মেয়েটিকে চলে যেতে দেখে কবির মনে হয়েছে, যেন শাড়িই নয়, কবির পরাণকেও সে নিঙড়ে নিঙড়ে চলেছে ।

কিন্তু - কিন্তু এইখানেই ইতি নয় কল্পনার ।

মনে হয়ে মেয়েটি পরেছে একটি রেশমি শাড়ি—নীল এবং রেশমের । ঢাকা বা মুর্শিদাবাদ, কাশ্মীর বা মহীশূর কোন্ দেশের তা অবশ্য জানা নেই ।

আপনি তর্ক করতে পারেন, শাড়িটি নীল হলেই হল । ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের প্রয়োজন কোথায় ? কিন্তু, নিজেই ভেবে দেখুন, ওপরের পদটি আপনার মনে কি অন্য কোনও ভাবের উদ্রেক করে ? আপনি কি ভাবতে পারেন, বঙ্গলক্ষ্মী মিলের চল্লিশ নম্বর সুতোব মোটা একখানা নীল রঙের শাড়ি বা তাঁতের করকরে মোটা একখানা নীলচে শাড়ি-পরা একটি

মেয়ের কথা ? ভাবতে পারেন, ওই শাড়িপরা একটি কালোকুলো রোগাভোগা মেয়ে ভিজতে ভিজতে আসছিল ফুটপাথের জলে চটি চটচট করতে করতে এবং বৈষ্ণব-গীতিকার তাই দেখে লিখবেন এই কবিতা ? কক্ষনো না ।

অতএব বুঝে দেখুন, এই কথার পর কথা সাজানোয় অর্থের কত পার্থক্য ।

সেকালের স্ত্রী চিঠি লিখছে স্বামীকে ।—

"টাকার জন্য ভাবিবে না । ভালো একটি নীল রঙের শাড়ি আমার জন্য আনিবে । আর খোকার জন্য একটি ইজের, কিছু গুঁড়া হলুদ, কালো মুগ ও লবঙ্গ আনিবে ।"

স্ত্রীটির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, বিশ্বাস করুন । স্বামীটিকেও চিনি না । তাদের আর্থিক অবস্থাও তাই একেবারেই আমার জ্ঞানের বাইরে । তবু, এই লাইন ক'টি থেকে বলে দিতে পারি যে, স্ত্রী টাকার জন্য ভাবতে নিষেধ করলেও স্বামীটি দশ-পনেরো টাকার বেশি দামের কাপড় কিনতে পারে না । এ শাড়িটিও হবে মোটামুটি আটপৌরে ধরনের ।

সেকালিনী আর এক স্ত্রীর পত্র ।

"আসমানী নীল রঙেরটাই কিনো, চকলেট রঙ কি আমায় মানায় নাকি ? খুকী কাল টেবিল-লাইটের শেডটা ভেঙেছে ।"

পঁচিশ থেকে তিরিশ ।

"পেণ্ডেন্টটা চমৎকার হয়েছে । কিন্তু মাঝখানে লাল পাথর কেন ? ও দোকানটা ছাড়ো । কি বিশ্রী রুচি ওদের, মাগো !

শাড়িটা পেয়েছি । ভারী চৎকার । ঠিক সমুদ্দুরের মতো নীল । রাত্তিরে যা ঝকমক করে !"

পঞ্চাশোর্ধ্বে ।

"মুক্তোর মালাছড়াটা ফেরত পাঠালাম । পছন্দ হয়নি । হয় মুক্তোগুলো বড় বড় হবে, আর নয়তো দু'লাইন ছোট ছোট মুক্তো থাকবে । শাড়িটা মোটের ওপর মন্দ নয় । রংটা কোবাল্ট ব্লু, আর একটু গাঢ় হলে ভাল হত । আলট্রা মেরিন ছিল না ?"

ফ্যান্সি প্রাইস—হাজার দেড় হাজার ।

অতএব বুঝতেই পারছেন, কথার পর কথা সাজানোর একটা কারসাজি আছে । এই কারসাজির জন্য অবশ্য কত সাজাও না পেতে হয় আমাদের মাঝে মাঝে !

বান্ধবী তখন মধুপুরে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে গেছেন । প্রেমপত্রের শেষে লিখেছিলেন : "এখানে ভাল ধোপা মেলে না । কিছু কাপড়ের নীল

পাঠিয়ো ।"

আমচকা একটা উপহার পাঠিয়ে তাঁকে খুশি করতে ইচ্ছে হয়েছিল । আর উপহারের সেরা একখানা নীল শাড়ি ।

শাড়িখানি যথারীতি কিনেই পাঠিয়েছিলাম, নীলটা পাঠাতে মনে ছিল না ।

কিছুদিন পরেই চিঠি এল ।

"তোমার পাঠানো নীল শাড়িটা পেয়েছি । নীল আর পাঠাতে হবে না, তোমার প্রয়োজন থাকে তো লিখো, বোতলে পুরে পাঠিয়ে দেব । শাড়িটা ধুতেই অনেক নীল . . ."

সে দুঃখ আমার কোনওদিন যাবে না । আজ যেমন দুঃখ হয়, কেন সুযোগ পেয়েও কোনওদিন রীতিমত পেশাদার সাহিত্যিক হবার বাসনা হয়নি । আমার জীবনটাই বোধহয় পেয়ে-হারানোর জীবন । তা না হলে সুমিত্রাকে এ ভাবে হারাতাম না নিশ্চয়ই ।

কে জানত, যে সুমিত্রার কাছে সাহিত্যখ্যাতিটাই সব চেয়ে বড় ছিল । সাহিত্যিক হতে পারলে হয়তো সুমিত্রা আমার জীবনসঙ্গিনী না হোক্, জীবনরঙ্গিণী হতে পারত ।

কিন্তু কেন এতদিন সাহিত্যিক হইনি বা হবার ইচ্ছে হয়নি, সে-কথাই আগে বলি ।

১০

বহুদিন আগেকার কথা ।

তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিন সশরীরে রসচক্রের আসরে উপস্থিত হতেন । অবশ্য শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছনোর পরই 'রসচক্র' আড্ডাটিকে সার্থকনামা মনে হত । তার আগে যাঁরা এসে গুলতানি শুরু করতেন, তার নাম ছিল, অবশ্যই শত্রুপক্ষের মুখে, 'টেক্সট্ বুক কমিটি' । ফিসফিস করে তাঁদের শুধু আলোচনা হত, কার বই কোন ইস্কুলে ধরানো হল, কোন্ ইস্কুলে বই ধরাবার আগে কোন লোককে ধরতে হবে ইত্যাদি । সেদিনও এই ধরনের কথাবার্তা হতে হতে কে একজন (নামটা ঠিকই মনে আছে কিন্তু বলা চলে না) জিগ্যেস করলেন, বই লিখে টাকা করা ভাল, না টাকা করে বই লেখা ভাল ?

অন্য একজন বললেন, সাহিত্য যখন করবে তখন টাকার কথা ভাববে না ।

প্রথমজন বললেন, তা হলে সাহিত্য করে লাভ ?

—লাভ সম্মান । সাহিত্যিক যে সম্মান পায় অন্য কেউ সে সম্মান বা সে শ্রদ্ধা পায় না ।

কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র । ঘরে ঢুকতে ঢুকেত বললেন, খাঁটি কথা । শোনো তা হলে বলি ।

বলেই বসলেন শরৎচন্দ্র, লাঠিটা পাশে রেখে । টেক্সট্ বুক কমিটি মুহূর্তের মধ্যে পিন্-পড়া-নিস্তব্ধতায় রসচক্রে রূপান্তরিত হল ।

তরুণ বয়েসীরা শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত । একজনের মুখভাব লক্ষ করে শরৎচন্দ্র বললেন, বাপু হে, তুমি ভাল করে শোনো ।

বোধহয় তার সাহিত্য-বাতিক আছে সন্দেহ করেই বললেন । সে উত্তর দিল, আপনার কথা ভাল করে না শুনে কি কারও উপায় আছে ?

শরৎচন্দ্র হাসলেন ।

তারপর বললেন, গ্রামে গিয়েছি সেবার । বইটই লিখে আমি বেশ টাকা-কড়ি করেছি ধারণা হয়েছে গাঁয়ের সকলের । মনে মনে আমারও ধারণা, সবাই রীতিমত শ্রদ্ধাটদ্ধা করে বুঝি আমাকে । গ্রামের অনেকে আমাকে 'ঠাকুর' বলে ডাকত, উপদেশ-টুপদেশও নিত । তাই বুক ফুলিয়ে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়াতাম । একদিন পাঁচুর মায়ের বাড়ির পাশ দিয়ে

যেতে যেতে দেখি পাঁচুর মা পাঁচুকে ঠ্যাঙাচ্ছে । কি ব্যাপার ? না, ছেলে একেবারে পড়াশুনো করে না । দিনরাত টো-টো করে বেড়াচ্ছে, বই খুলে বসার নাম করে না । এতখানি বয়স হল, প্রথম ভাগ আর শেষ হয় না ছেলের । বললাম, আহা-হা তা বলে মারছ কেন পাঁচুর মা ? পাঁচুর মা বললে, আর বোলো না ঠাকুর । ছেলে পড়াশোনার ধার দিয়ে যে যায় না একেবারে, খাবে কি ? তাও বলি, দারোগা হাকিম হওয়ার মতো বিদ্যে না হোক্ বর্ণপরিচয়টা তো শিখে নিতে পারিস । তা হলে আর কিছু না হয় ঠাকুরের মতো পাঁচখানা বই লিখেও তো খেতে পরতে পাবি !

শরৎচন্দ্রের এই গল্প অবশ্য, শুনেছি, অন্য শ্রোতাদের কাছে অন্যরূপে কথিত হয়েছিল । সে-ক্ষেত্রে পাঁচুর মা হয়েছিল কলকাতারই কোনও এক মেসের ঝি ।

তা যাই হোক, এই গল্প শুনেই সাহিত্য-বাতিক ঘুচে গিয়েছিল আমার । কারণ, তখন সাহিত্য করে শুধু পাঁচুর মায়ের কাছেই সম্মান পাওয়া যেত, টাকা পাওয়ার কথা বড় একটা ভাবত না কেউ ।

বলবেন হয়তো, বই কি বিক্রি হত না তখন ? অত অত লাইব্রেরি ছিল, তারা তো বই কিনত, তবে কেন লেখকরা টাকা পেত না ।

এ-সম্পর্কে আমার মতো অন্য ।

ধরুন মার্ক টোয়েনের লাইব্রেরির কথা ।

মার্ক টোয়েনের মতো লাইব্রেরি সে যুগে খুব কম লোকেরই ছিল । অন্তত কোনও মার্কিন পাঠকের ছিল না । কিন্তু এই বিখ্যাত ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকটির একটি বিচিত্র অভ্যাস দেখে তাঁর এক বন্ধু বিস্মিত না হয়ে পারেননি । হাজার হাজার বই যাঁর বাড়িতে এবং এই হাজার হাজার বই যিনি রীতিমত মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তিনি বই রাখবার একখানা আলমারিও কি কিনতে পারেন না ? রান্নাঘরের তাক থেকে শুরু করে খাটের তলা, পিয়ানোর ডালা, এমনকী জুতো রাখার র‍্যাক অবধি সর্বত্র রাশি রাশি বই ছড়ানো পড়ে আছে । আর কোনও একটা বইয়ের যদি হঠাৎ দরকার পড়ল তো জিনিস পত্তর টেনেহিঁচড়ে এমন ওলোটপালোট করতে হয় যে, বাইরের যে কোনও লোক ভাববে বাড়িটায় বুঝি নতুন করে চুনকাম হচ্ছে । তা সত্ত্বেও একখানা আলমারি কেনেন না কেন মার্ক টোয়েন ওরফে ক্লিমেন্স ?

তাই বিস্মিত হয়ে বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন, বইগুলো একটা আলমারিতে রাখলেই ভাল হত না মিঃ ক্লিমেন্স ?

মার্ক টোয়েন হেসে উত্তর দিলেন, তা হত । কিন্তু বইগুলো যেভাবে আনা হয়েছে আলমারিটা কি সেভাবে আনা যাবে ?

অর্থাৎ বন্ধুই হোক বা শত্রুই হোক, যার বাড়িতেই যেতেন তিনি, পড়বার জন্যে একখানা বই চেয়ে আনবেনই । বাঃ, চমৎকার বই তো, পড়তে এত ইচ্ছে হচ্ছে । নিয়ে যাব একদিনের জন্যে ? কালই ফেরত দেব ।

ব্যস, তারপর আর ফেরত হয়ে দেওয়া উঠত না ।

তাঁর এ বিচিত্র অভ্যাসের ফলেই হয়তো, তাঁর এক প্রতিবেশীকে একখানা বই ধার চেয়ে ঘা খেয়েছিলেন মার্ক টোয়েন । প্রতিবেশীটি জবাব দিয়েছিলেন, আমার বই আমার বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে দেব না । পড়তে হয় এখানে বসেই পড়তে হবে ।

দিনকয়েক পরে এই প্রতিবেশী ভদ্রলোকের দরকার পড়ল ঘাসকাটা যন্ত্রের অর্থাৎ লন-মাওয়ারের । মার্ক টোয়েনের কাছে সেটা ধার চাইতেই উত্তর দিলেন তিনি, বেশ তো । কিন্তু ওটা তো বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না । তবে যত ইচ্ছে আমার বাগানের ঘাস আপনি কাটতে পারেন ।

আমাদের সকলেরই যেমন বই চেয়ে এনে আর ফেরত দেবার কথা মনে থাকে না, তেমনি আবার মার্ক টোয়েনের দেওয়া উত্তর শুনতে হবে এই ভয়ে বই ধার না দিয়েও উপায় থাকে না ।

বই যে কে কেনে তা রিসার্চ না করলে আবিষ্কার করা যায় না । কারণ, আমার বাড়িতে যে বইগুলো আছে সেগুলো আমি কিনিনি । অবশ্য আমি যে ক'খানা কিনেছি সেগুলো নিশ্চয় আপনার বা আপনার বন্ধুর বাড়িতে পাওয়া যাবে । বই যে হাতে হাতে কতবার বেহাত হয় এবং শেষ অবধি স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে কত মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছয় তার হদিশ গোয়েন্দা বিভাগও দিতে পারবেন না ।

তাই আজকাল কেউ আর বই কেনে না বড় একটা । এ বস্তু ভাগ্যবানে কেনে আর বুদ্ধিমানে পড়ে । কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে দেখে আশঙ্কা হয়, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো প্রকাশকরাও বুদ্ধিমান হয়ে উঠবেন । বই আর ছাপাবেন না তাঁরা ।

কিছুদিন আগে লণ্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক মহাশয় এসেছিলেন কলকাতায় । গোটাকয়েক বইয়ের দোকানেও নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে । সে দোকানগুলো সবই কলেজ স্ট্রিটের আশেপাশে এবং তার মধ্যে কয়েকটি দোকানের সঙ্গে বিলিতি মালিকটির নাকি লাখ লাখ টাকার কারবার চলে । দেখেশুনে সাহেবের তো চক্ষুস্থির । বললেন, পৃথিবীতে এমনটি আর দেখিনি । বললেন, কলেজ স্ট্রিট একমাত্র বইয়ের বাজার পৃথিবীতে । এক জায়গায় এত দোকান এবং এত বেশি টাকার ব্যবসা,

তাঁর মতে, আর কোথাও হয় না ।

ইস্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক বা ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে সত্যিই বইয়ের 'বাজার' থাকতে পারে । কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বাজার ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে । দু'চারখানা বই বিয়ের উপহারের কল্যাণে রাতারাতি সংস্করণ হলেও অধিকাংশ বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় দপ্তরি ছাপা ফর্মা রাখতেও রাজি হয় না । বহু দপ্তরির শুনেছি বই বাঁধিয়ে পেট চলে না, কিন্তু গোডাউন চার্জ নিলে নাকি পায়ের ওপর পা দিয়ে দিব্যি চলে যেত তাদের ।

তা হলে বই কেনে কে ? কেনে তারাই যারা বইয়ের পাতা কাটতে ভুলে যায় কিংবা পুতুলের মতো বইকে বুককেসে সাজিয়ে রাখে, আর মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগের মতো হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । বই বিক্রির প্রধান কারণ বিয়ে । বিয়ের উপহার হিসেবেই যা কিছু বই বিক্রি হয় আজকাল । এত শস্তায় তো আর কোনও উপহার দেওয়া যায় না ।

আমি বলি, তাও ভাল । 'মরা মরা' বলতে বলতেই তো রত্নাকরের মুখে রামনাম শোনা গিয়েছিল !

১১

কিন্তু বই কেনার বা পড়ার কি সত্যি কোনও প্রয়োজন আছে ? কি আছে বইয়ের পাতায় ?

পূর্বকালে তবু সাহিত্যিকের প্রতিভা প্রকাশ পেত তাঁর রচনায় । আধুনিককালে তার সীমা সংকীর্ণ হয়েছে অনেকখানি । গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পিছনের মলাটে লেখা আত্মপ্রশস্তিতে এবং গ্রন্থের বিজ্ঞাপনেই আজকাল যা কিছু প্রতিভার স্পর্শ আবিষ্কার করা যায় । কিন্তু এসবের চেয়েও অনেক বেশি বৈচিত্র্য পাওয়া যায় গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে । বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস উৎসর্গ করে গেছেন সাধারণভাবে, তাই 'সীতারামে'র উৎসর্গ :

"সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্বগুণের আধার,
সকলের প্রিয়
আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র,
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম"

কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তরে' লিখেছেন "এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব ? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবতাকে উপহার দিই, পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল । মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম । এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে । যাঁহারা অনিদ্রা রোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থ আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম ।

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস"

উৎসর্গ-বৈচিত্র্যে অবশ্য বিদেশি গ্রন্থকাররাও পিছিয়ে নেই । জার্মান দার্শনিক জোহান্স কেপলার লিখেছিলেন :

বইটি লেখা শেষ হল, হয় আজকের আর নয়তো সুদূর ভবিষ্যতের পাঠকরা এ বই পড়বেন । তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই । এ বই পাঠকের জন্য একশো বছর অপেক্ষা করতে পারবে, কারণ স্বয়ং ভগবানই আমার মতো একজন দার্শনিকের জন্যে ৬০০০ বছর অপেক্ষা করেছিলেন ।

বলা বাহুল্য, এই দার্শনিকটির অন্যদের মতোই ধারণা ছিল মানুষ জন্মেছে মাত্র ৬০০০ বছর আগে ।

সম্প্রতি একটি বাংলা বইয়ের উৎসর্গ দেখলাম :

"তোমাকে"

এ ধরনের উৎসর্গের সুবিধে এই যে, ডজন খানেক প্রেমিকা এবং স্ত্রীকেও সন্তুষ্ট করা যায় ।

বিখ্যাত গীতিনাট্য-রচয়িতা পিত্রো মাস্কাগ্নি লিখেছিলেন :

"আমাকে"

যে একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি বই উৎসর্গ করেছেন 'বনফুল'কে :

"অকুতোভয় সাহিত্যবীর, মদক্ষরিতগণ্ড
কাব্য-দিঙ্নাগ
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
অকৃত্রিমহৃদয়েষু"

ভাই বলাই,

তোমার প্রতিভা, তোমার সৃষ্ট কোকিল, হাতি, গণ্ডার ও মাকড়সার মতো স্পেশালাইজেশন স্বীকার করে না, সাহিত্য মহীরুহে সকল শাখা প্রশাখাতে তাহার অবাধ গতিবিধি । তাই এই ক্ষুদ্র নূতন শাখাটি তোমাকে উৎসর্গ করিলাম ; ভরসা করি অচিরাৎ ইহাতে আরোহণ করিয়া তুমি আমাদের নয়নরঞ্জন করিবে ।

কৌতুকপূর্ণ আরেকটি উৎসর্গ পি জি ওডহাউসের ;

"আমার স্নেহের কন্যাকে"
সর্বসময়ে যার সাহায্য ও আগ্রহ
না থাকলে এ বই এর অর্ধেক সময়ের
মধ্যেই লেখা হতে পারত"

ফ্রান্সিস হেকেট উৎসর্গ করেছেন :

"আমার স্ত্রীকে
এ বই সম্পর্কে যা কোনও আগ্রহ
না থকায় বারংবার হতাশ হয়েছি"

কিন্তু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন বাংলাদেশের একজন আধুনিক গ্রন্থকার । তাঁর একখানি বই উৎসর্গ করেছেন তিনি বারোজন বন্ধুকে এবং সর্বশেষে 'পুনশ্চ' যোগ করে ত্রয়োদশজনের নাম দিয়েছেন ! বলা বাহুল্য, এই "পুনশ্চ" চিহ্নিত ব্যক্তিটির সঙ্গে গ্রন্থকারের সর্প-নকুল সম্পর্ক ।

সরল মনের উৎসর্গও অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই দ্ব্যর্থবোধক হয়ে

পড়ে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় ।

পরমশ্রদ্ধেয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন :

কবি কালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'দাদা,

রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয় । সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই অপানার সুপরিচিত...এই মানুষের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না । তুলে দিলাম আপনার হাতে । ইতি

তারাশঙ্কর"

অর্থাৎ যাঁকে উৎসর্গ করা হল তিনি শিক্ষিত সমাজের বাইরের মানুষ ?

ব্যঙ্গবাণে সিদ্ধহস্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । বনফুলকে গাছের শাখায় শাখায় বিচরণ করিয়েই ক্ষান্ত নন । তাঁর 'ব্যুমেরাং' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, গল্পগুলি তিনি একে একে সম্পাদকদের লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু লক্ষভেদ না করতে পেরে সেগুলি যথারীতি ব্যুমেরাং-এর মতোই ফিরে আসে । তাই সে গ্রন্থের উৎসর্গ :

"বাংলার মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক মহোদয়গণের

করকমলে'

পরিমল গোস্বামী তাঁর 'মারকে লেঙ্গে' বইয়ের উৎসর্গপত্রে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচজন সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে লিখেছেন :

"এঁরা প্রত্যেকে আমাকে বই উৎসর্গ করেছেন । আমার বই এঁদের কাকে উৎসর্গ করব ভাবছি ।"

শিবরাম চক্রবর্তীর 'মনের মতো বৌ' গ্রন্থের উৎসর্গের বৈচিত্র্য কিন্তু মনে রাখবার মতো :

"মনের মতো বৌ যদিও একমাত্র নিজেকে ছাড়া প্রাণ ধরে আর কাউকে দেবার মতো নয়, তবুও এই লেখক এই পরমবস্তু একান্ত নিঃস্বার্থে যাদের বিয়ে হলো, যাদের বিয়ে হলো না, যাদের বিয়ে হয়েছে এবং যাদের এখনো হয়নি, যাদের বিয়ে হবে এবং যাদের কখনই হবার নয়, যাদের আশা আছে এবং যাদের কোন আশা নেই, তাদের সবার হাতেই অকাতরে উৎসর্গ করেছেন ।"

আমি এই যে বই লিখছি, এটার কি 'উৎসর্গ' করা যায় আমি কিন্তু

এখনও ভেবে পাইনি ।

মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, উৎসর্গ করব কল্পনা বসুকে । অবশ্য বই ছাপা হয়ে টাইটেল ছাপা হতে হতে যদি না কল্পনা দেবী তাঁর বাস্তব সিঁথিতে চওড়া সিঁদুরের টান দিয়ে বসেন ।

আর সত্যি কথা বলতে কি, কল্পনার জন্যেই আমার এই সাহিত্য-সাধনা । ইতিপূর্বে যে আমাকে একবার সিনেমা-ডিরেক্টার হবার বাসনা পেয়ে বসেছিল, সেও এই কল্পনার জন্যেই ।

আজকাল মেয়েরা যেমন সিনেমার কাগজ দেখলে বা অভিনেতা অভিনেত্রীকে দু'পায়ে হেঁটে যেতে দেখলে (চার পায়ে না হেঁটে মানুষের মতো তারাও দু'পায়ে হাঁটে, বিশ্বাস হয় না বলেই হয়তো) হুড়মুড় করে এসে জড়ো হয়, তাতে আমারও ধারণা ও-লাইনে আর কিছু না হোক মেয়েদের মন (?) পাওয়া যায় । কিন্তু, সিনেমা ডিরেক্টার হতে গিয়ে দেখলাম, সে ধারণাও ভুল ।

অবশ্য পরিচালনা আমাকে করতে হয়নি । কারণ শেষ পর্যন্ত টাকাই জোগাড় করতে পারেননি আমার ছেঁড়া চটির প্রোডিউসার । তা বলে, লোকসান হয়েছে আমার, তাও ভাববেন না । লাভই হয়েছে । লাভ হয়েছে একটি লাইব্রেরি ।

কি ভাবে বুদ্ধিটা খেল গেল বলছি ।

ছবি তুলব ঠিক করতে, প্রোডিউসর বললেন, কোন্ গল্প ?

সুতরাং গল্প খুঁজতে শুরু করলাম । নিজের তো কিছুই পড়া ছিল না, একে ওকে, কাগজের সম্পাদক ও সাহিত্যিকদের জিগ্যেস করে বেড়াই । কে যেন বললেন, অমুকের গল্প নিন, ওঁর চেয়ে ভাল গল্প আর এযুগে কে লিখতে পারে !

ঠিকানা জোগাড় করে একদিন গিয়ে হাজির হলাম অমুকের বাড়িতে । ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, আমি অমুক ।

বসতে বললেন না ।

তবু কিন্তু কিন্তু করে বললাম, আপনার গল্পের বই চাই একখানা । আমি আপনার একটা গল্প নিয়ে ছবি করতে চাই ।

অমুকবাবু ভুরু কুঁচকে মৃদু হেসে বললেন, একটা ছবি তুলতে কত খরচ হয় ?

বললাম, তা, দেড় লাখ টাকা । দেড় লাখেই তখন ছবি তোলা যেত ।

গম্ভীর গলায় উত্তর এল, আমার বই সব দোকানেই পাওয়া যায়, কিনে

নেবেন ।

বললাম, আপনার কাছে নেই এক কপি ?

উত্তর এল, দেড় লাখ টাকা খরচ করে ছবি তুলতে পারবেন, আর দেড় টাকা দু'টাকা খরচ করে একখানা বই কিনতে পারবেন না ? বরং বলুন, সিনেমার নাম করে সকলের কাছ থেকে বই নিয়ে একটা বিনামূল্যে লাইব্রেরি গড়ে তুলছেন ।

ব্যাস ।

শুনেই বুদ্ধিটা খুলে গেল । ছবির নাম করে একে একে প্রায় সব লেখকের সব বই-ই জোগাড় হয়ে গেল । দুর্দিনে সেগুলো অনেক কাজে লেগেছে আমার, প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বেশ ভাল দাম পেয়েছি ।

১২

কিন্তু সিনেমার নেশা ছেড়ে সাহিত্যের নেশা কেন ধরল সে কথাই বলি ।

এ নেশার মূলে বসন্ত । না রোগও নয়, ঋতুও নয় ।

বাংলাদেশে বসন্ত দেখা দেয় শুধু কাব্যে । আমাদের অন্তরঙ্গ ঋতু হল শরৎ । রৌদ্রঝরা দুপুর আর বৃষ্টিঝরা বিকেল পার হয়ে এসে হঠাৎ একদিন ভোরের আলো দেখে চমক লাগে মনে । সোনা-রঙের রোদ্দুরে শান্ত শীতল ছায়া পড়ে । শরৎ এসে উঁকি দেয় খড়ের চাল আর দিঘির ঘাটে, অ্যাসফল্টের রাস্তায় আর অসূর্যম্পশ্য সওদাগরি আপিসের জানালায় ।

শুধু কি তাই ? শরতের রোমাঞ্চ জাগে মানুষের মনেও । জীবনের সঙ্গে তাই শারদোৎসবের এমন সুস্পষ্ট সমন্বয় । অন্য দেশ বসন্তকে যেভাবে উপভোগ করে, বাঙালি ঠিক তেমনি ভাবেই শরতের বাতাসে নিশ্বাস টানে । জীবনের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন উৎসবের অঙ্গ হয়ে দেখা দেয় । তাই আনন্দশিল্পের সব ক'টি বিভাগ উচ্ছ্বসিত রূপ নিয়ে হাজির হয় এই শারদ আরম্ভে ।

সারা বছর কি বাংলার সাহিত্যসৃষ্টি থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ? না দিনে দিনে কাব্যে আর সাহিত্যে নতুন থেকে নতুনতর পরীক্ষা ও সৃষ্টির অভিনবত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু সারাটা বছর সাহিত্যরসিকের মন যেন মধুলগ্নের চূড়ান্ত আনন্দক্ষণে পৌঁছবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে ।

অবাঙালির কাছে দীপাবলি, ইউরোপের কাছে ক্রিস্টমাস, ইসলামের পৃথিবীতে ঈদকে ঘিরেও সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন কেঁপে ওঠে সত্যি, কিন্তু বাংলার মতো এমন উচ্ছ্বসিত আবেগে নয় । জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির মিলন কবে এবং কি ভাবে প্রথম দেখা দিয়াছিল তা আজ হয়তো বলা দুরূহ । তবে সমগ্র বাঙালি-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল 'শারদীয়া সংখ্যা'র দৌত্যে । প্রথম শারদীয়া সংখ্যা বাংলার সাহিত্যসম্ভারকে পৌঁছে দিয়েছিল জনসাধারণের ঘরে ঘরে । জনজীবনে জাগিয়ে তুলেছিল শিল্পসংস্কৃতির নতুন স্পন্দন । উৎসবকে উপলক্ষ করে আনন্দের বন্যা সব দেশেই দেখা দেয়, কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এমন সুদৃঢ় যোগাযোগ আর কোথাও ঘটে না ।

বাংলার মাটিতে যে সাহিত্যপ্রীতি ছড়িয়ে আছে, সারা বছর রৌদ্রের আড়ালে থেকে অঙ্কুর উদ্গমের সময় কাটে তার, তারপর হঠাৎ এক মহালয়ার মুগ্ধমুহূর্তে পাতা ফুল ফল হয়ে দেখা দেয় বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি ।

সমস্ত জনসমাজ—অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ থেকে উন্নাসিক শহরবাসী—সকলেই এই সময়টিতে সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন : পত্রিকা থেকে পত্রিকায়, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থে পাঠকের মন আর চোখ ছুটে চলে । আনন্দ আর তৃপ্তি । কখনও হয়তো হতাশা আর অভিযোগ । আলোচনার আলোড়ন শোনা যায় চতুর্দিকে । কবি আর কথাশিল্পী—খ্যাতির ব্যারোমিটারে কারও কারও হয়তো পারার চিহ্ন ওপরে ওঠে । কেউ তলিয়ে যান অপ্রিয়তার অন্ধকারে । তারপর একসময় সব আলোড়ন থেমে যায় । পিছনের ইতিহাসটুকুও কেউ জানতে চায় না ।

পুজো আসছে ! পুজো হয়তো তখনও তিন মাসের দূরত্বে । আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পাঠক-পাঠিকার মন তখন হয়তো কালিদাসের মন্দাক্রান্তায় নিমগ্ন । তখন থেকেই পত্রিকার জগতে একটি মাত্র চাঞ্চল্য—পুজো আসছে ! বার বার ক্যালেন্ডারের পাতা দেখা, আর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সম্পাদকের পরিকল্পনা । চিঠির পর চিঠি, অনুরোধের পর অনুরোধ যায় যে সব খ্যাতনামা লেখকরা কম লেখেন অথচ ভাল লেখেন তাঁদের নামে । যাঁরা খ্যাতনামা এবং জনপ্রিয়, প্রবীণ এবং নবীন, বাংলাদেশের পাঠকপাঠিকারা যাঁদের রচনার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছেও অনুরোধের চিঠি যায় । কবিতা গল্প প্রবন্ধের জন্যে উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা দেবার সঙ্গতি যে সব পত্র-পত্রিকার আছে এবং জনপ্রিয়তা ও ঐতিহ্যে যে সব পত্রিকা উন্নতমান, লেখকরা স্বভাবতই সেই সব পত্রিকায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাটি পাঠিয়ে দেন । অন্যান্য পত্রিকার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কারণ না থাকলে, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনাটি দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন । পাঠকরা অভিযোগ করেন । কিন্তু সাহিত্যিকরা নিরুপায় । সাহিত্যের এই মরশুমেই তাঁদের উপার্জনের মরশুম । তাঁরা জানেন, খ্যাতির জন্য প্রচারবহুল দুটি পত্রিকায় দুটি উৎকৃষ্ট রচনাই যথেষ্ট । চাকুরের বোনাস আছে, ব্যবসাদারের পুজোর বেচাকেনার অতিরিক্ত লাভ আছে । কিন্তু সাহিত্যিকের ? রচনার সংখ্যা । কারণ সংখ্যাই তাঁর উপার্জনের অঙ্ক নির্দেশ করে, গুণ নয় । তা সত্ত্বেও ছোটখাটো স্বল্পজ্ঞাত পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় কি ভাল রচনা প্রকাশিত হয় না ? হয় । কারণ সাহিত্যিক সর্ব সময়ে নিজের রচনার গুণাগুণ বিচার

করতে সমর্থ হন না। তা ছাড়া ছোটখাটো পত্রিকার প্রধান সম্পদ একেবারে তরুণ লেখকদের রচনা, যা কখনও কখনও সাহিত্য-জগতে চাঞ্চল্য আনে, অজ্ঞাতকে বসায় খ্যাতির আসনে।

তাই এই সময়টিতে চলে একদিকে সম্পাদকদের প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে লেখকদের। কোন সম্পাদক চান না যে তাঁর কাগজটি সাহিত্যের বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হোক্, সাহিত্যানুরাগীদের হাতে হাতে ঘুরুক, আর সবচেয়ে বড় কথা—প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টল থেকে উধাও হয়ে যাক দু'দিনের মধ্যে। তাই দিনের পর দিন কাটে তাঁদের কোন কোন লেখকের গল্প যাবে, কোন কোন প্রখ্যাত শিল্পী ছবি আঁকবেন, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কে লিখবেন এবং কি লিখবেন, কবিতা আদৌ ছাপা হবে কি না এই ভেবে। (লজ্জার কথা যে বাংলাদেশে এমন পাঠকও এখনও আছেন যিনি প্রবন্ধকে অপাঠ্য ভাবেন, আধুনিক কবিতাকে অস্পৃশ্য।) শুধু কি তাই? এক পত্রিকার সম্পাদক খোঁজ নেন অন্য পত্রিকার, শুধু লেখকের নাম এবং রচনার গুণবিচারেই সন্তুষ্ট হন না তাঁরা। চেষ্টা করেন শারদীয়া সংখ্যার বৈশিষ্ট্য রাখতে, অভাবনীয় বিষয়বৈচিত্র্যের আকর্ষণে সংখ্যাটিকে মূল্যবান করে তুলতে।

উৎসাহটা লেখকদের মধ্যেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় এই সময়টিতে। ভাল লিখতে হবে, আরও ভাল লিখতে হবে। এ হ'ল সাহিত্যিকদের মনের কথা।

এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের দেখা হলেই এ সময় একটিই প্রশ্ন।—ক'টা লিখলেন? কোথায় কোথায় লিখলেন? অমুক কাগজ চিঠি দিয়েছে, অমুক কাগজ বার বার তাগাদা দিচ্ছে।

উত্তর সকলেরই এক।—এবারে একেবারেই লিখতে পারছি না। সাংসারিক ঝঞ্ঝাট, মনমেজাজ ভাল নেই, শরীর, অসুস্থ, আপিসে কাজের চাপ। একটাই লিখব, অমুক কাগজে।

সব লেখকই এই এক কথা বলেন, কিন্তু মহালয়ার সপ্তাহে একটির পর একটি পত্রিকা স্টলে এসে পৌঁছয়, আর দেখা যায় প্রায় সব পত্রিকাতেই তাঁদের লেখা শোভা পাচ্ছে।

গুণ ছেড়ে গুনতির দিকে মন দিতে হয়েছে লেখকদের, শুধু কি অর্থের জন্যে? না। পাঠকরা গুণ দেখলে লেখকের নামটির দিকে চোখ দেন না, মনে রাখেন শুধু সেই সব নাম যেগুলি বার বার চোখে পড়ে তাঁদের,তাই বাধ্য হয়েই বেশি লিখতে হয় লেখকদের। আর এই বেশি লেখার নেশায় কোনও কোনও লেখক নাকি শুধু নিজেই বাঁ হাতে এবং ডান হাতে লিখে ক্ষান্ত নন, আত্মীয়স্বজনকে দিয়েও গল্প প্রবন্ধ লিখিয়ে

নিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দেন । আর এই সব নিকৃষ্ট রচনাগুলি গিয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো নতুন পত্রপত্রিকার ঘাড়ে । অর্থ উত্তেজনা আদর্শ খরচ করে সেই সব পত্রিকাগুলি ছাপা হয়, স্টলে যায় এবং স্টল থেকে যথাসময়ে ফিরেও আসে । তা সত্ত্বেও তাদের উপদেশ দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে বিরত করার কথা ভাবেন না লেখকরা, ভাল রচনা দিয়ে সহযোগিতাও করেন না ।

কিন্তু এসবই তো খ্যাতনামাদের কথা । আড়ালে যাঁরা পড়ে রইলেন, অর্থের দিকে যাঁদের দৃষ্টি নেই, খ্যাতি বাহ্য, শুধুমাত্র সাহিত্যসাধনাই যাঁদের জীবনে এখনও আদর্শ হয়ে টিকে আছে, সেইসব তরুণ অগণ্য, অজ্ঞাত লেখকদের কথা কি কেউ একবারও ভাবেন এই হট্টগোলের হাটে ? একজন লেখক একবার ভেবেছিলেন তাদের কথা :

“সম্পাদকের টেবিলের নীচে
কাগজ-ফেলার ঝুড়ি,
জমে আছে যত অনির্বাচিত
কবিতার কারিকুরি ।
বোবা আখরের বাজে আঁকিবুকি,
তবু তারি ফাঁকে আকাশের উঁকি
ছিল না কি এতটুকু ?
ছিল না কি আঁকা কারো কালো আঁখি
কালো চুল রুখু রুখু ।
মিলন ওদেরো মিলে নাই, তাই
কবিতারো নাহি মিল ;
উমা ছিল ঠিক উপমায় কিছু
হয়েছিল গরমিল !”

দিনের পর দিন রাতের পর রাত জেগে উন্মত্ত আবেগে যে তরুণদল এই মরশুমের উদ্দীপনায় লিখে চলেন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,—ভয়ভীরু বুকে পাঠিয়ে দেন সম্পাদকের দরবারে, না জেনে সম্পাদককে বিরক্ত করেন বার বার, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করেন, তারপর একটির পর একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়, দুরু দুরু বুকে অধৈর্য আবেগে এসে দাঁড়ান তাঁরা স্টলের ধারে । প্রতিদিন একটির পর একটি পত্রিকার সূচীপত্রের ওপর ব্যর্থ দৃষ্টি বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে ফিরে যান । কিন্তু সে দীর্ঘশ্বাস কি এই উৎসবমুখর দিনে কেউ শুনতে পান, কেউ কি সহানুভূতি জানান আগামীদিনের সেই সব খ্যাতনামাদের ?

তাঁদের রচনার ত্রুটি আপন প্রচেষ্টাতেই সংশোধিত হবে একদিন,

ভাষায় ভণিতায় ভুল থাকবে না, গুণ উন্নত হবে—আর সেদিন স্বীকৃতি ও খ্যাতি দুইই জুটবে তাঁদের । এবং অর্থও ।

তারপর ?

তারপর তাঁরাও হয়তো, গুণ নয়, গুনতির দিকেই চোখ রাখবেন ।